শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক অভিযান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক অভিযান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা, এম.এ. বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক অভিযান

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা জুলফিকার আলী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা মিয়াজী মঙ্গোলোরী ও মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট থেকে অর্জন করেন।

তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সহকারী শিক্ষক রুপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীতে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সদরুল মুদাররেসীন পদে সমাসীন হয়ে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করে রাখেন।

শায়খুল হিন্দ শিক্ষকতার পাশাপাশি জাতীয় চেতনাকে শানিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য কর্মজীবনের শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেহেতু শ্যামলীর যুদ্ধের সিপাহসালার মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন, তাই তিনি ভালভাবেই জানতেন যে মাওলানা কাসিম নানুতুবী দেশকে স্বাধীন করার মানসেই এই দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। তাই তিনি লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মানসে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সামারাতুত তারবিয়াহ' নামে দারুল উলুমের প্রাক্তন ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন।

শায়খুল হিন্দ এতটাই স্বাধীনতাপাগল ও ব্রিটিশবিরোধী ছিলেন যে, উত্তর প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণর স্যার জেমস বলেছিলেন, "এই লোকটিকে (মাহমুদুল হাসান দেওবন্দ) যদি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় তাহলে উক্ত ছাই এর একটি কণাও ঐ পথ বা গলি দিয়ে উড়বে না যেখানে একজন ইংরেজ অবস্থান করবে। এই লোকটিকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকটি খণ্ডই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে।" (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা – ৩০)

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্র মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে দেওবন্দে ডেকে এনে দারুল উলুমের ফারেগ হওয়া প্রাক্তচ ছাত্রদের সমন্বয়ে 'জমিয়াতুল আনসার' নামে এক সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রিয় শিক্ষকের নির্দেশে মাওলানা সিন্ধী তাঁর ১৮/১৯ বছরের (১৮৯১-থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) শিক্ষকতা, জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন ছেড়ে দিয়ে জমিয়াতুল আনসার সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সেই সংগঠনের সেক্রেটারি তিনি নিজে হন। এইভাবে তিনি উস্তাদের নির্দেশে আন্দোলনমুখর এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে মূলতঃ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) এর একটি সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী ছিল। তা হল দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠিত করে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা এবং ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীন করার মানসে তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া। আবশ্য তিনি দেওবন্দে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর ছাত্রদেরকে দেশ স্বাধীন করার মানসে এবং বিপ্লবী চেতনার আলোকেই গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দারুল উলুমের সদরুল মুদাররেসীন থাকাকালীন দেওবন্দ মাদ্রাসা আন্তর্জাতিভাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। ফলে বহির্বিশ্বের ছাত্ররাও এখানে পড়াশুনা করতে আসে। এ সময় সীমান্ত অঞ্চল এবং আফগানিস্তান থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে ফিরে যায়। তাদেরকেও তিনি সীমান্ত এলাকায় কর্মতৎপর করে তোলেন। যেহেতু সীমান্ত অঞ্চল ও আফগানিস্তান সামরিক তৎপরতার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল, তাই সেটিকে তিনি বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা করেন। সেজন্য তিনি সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের মাঝে বিপ্লবী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি হাজি তুরঙ্গজাই, মাওলানা সাইফুর রহমান, মাওলানা ফজলে রাববী, মাওলানা ফজলে মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আকবর প্রমুখ উলামায়ে কেরামদেরকে সে অঞ্চলে নিযুক্ত করেন। তাঁরা সকলে সীমান্ত অঞ্চলে বিপ্লবী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালান এবং বিক্ষিপ্ত উপজাতিদেরকে সুসংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান মূলতঃ কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ভারতকে ব্রিটিশ আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'আজাদ হিন্দ মিশন' নামে একটি বিপ্লবী

পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। এই পরিষদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন তিনি নিজেই। এই সদর দফতর ছিল দিল্লীতে। এই পরিষদের মাধ্যমে তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেন। একটি চুড়ান্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ বেনিয়াদেরকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার তাঁর স্বপ্ন ছিল। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের করালগ্রাস থেকে ভারতবর্ষসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মুক্ত হতে না পারলে মুসলমানদের দ্বীন ইসলাম নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভারতসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যাতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠে সেজন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন। তিনি মনে করতেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে আফগানিস্তান তুরস্ক, ইরান, হিজাজ, মিশর, সিরিয়াসহ অপরাপর মুসলিম দেশগুলোও পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে। এই ব্যাপক চিন্তাধারার আলোকেই তিনি তাঁর মিশনকে পরিচালিত করেন। t ইনি আরো মনে করতেন যে বিশ্বের বুকে মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে স্বাধীনতার সংগ্রামে মুসলমানদের অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মুসলিম প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এছাড়া এদেশের স্বাধীনতা ও মুসলিম বিশ্বের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। এজন্য তিনি নিজেকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেও মুসলিম বিশ্বকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তৎপর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে গোপন সামরিক অভ্যুত্থানের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে এই ঐক্যমতে উপনীত হন যে, তুরস্কের বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে এসে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ করবে এবং একই সময় ভারতবাসীও বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এভাবে ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করে তুর্কী বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে।

শায়খুল হিন্দের কর্মতৎপরতাঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। গোটা বিশ্ব তখন দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ইংল্যান্ডের মিত্রশক্তি হিসাবে ছিল ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া,

বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। অপরদিকে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে তাদের বিপরীতে ছিল জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক।

যখন এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলে তখন শায়খুল হিন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির একটি মিটিং দেওবন্দে শায়খুল হিন্দের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিংয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯১৭ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব পরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থান ঘটানো হবে। কমিটি এ মর্মে একটি সাক্ষর চুক্তি করে তা শায়খুল হিন্দের নিকট হস্তান্তর করে এবং ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দ তুর্কী ও আফগান সরকারদ্বয়ের সাথে যে চুক্তি করেছিলের, মুখোমুখী আলাপ – আলোচনার মাধ্যমে তা চুড়ান্ত করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

শায়খুল হিন্দের ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কড়া নজর রেখেছিল। কেননা ইয়াগিস্তানের বিদ্রোহে ব্রিটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা হয়। ইয়াগীস্তানের পথ অনুসরণ করে বেলুচিস্তানবাসীরা করাচী কেন্দ্রের অধিনায়ক মুহাম্মাদ সাদিকের যুদ্ধকৌশলে বেশ বিব্রত হয়। মিঃ টমসনকে তাঁরা ‘কুতুল উমরা’ নামক স্থানে বন্দী করে রাখেন। মিঃ টমসন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১৭০০ ব্রিটিশ সৈন্য মারা যায়। এই যুদ্ধে শায়খুল হিন্দ আফগানিস্তান, তুরস্ক ও ইয়াগীস্তান প্রভৃতি দেশের সাহায্য নিয়ে আফগানী মুজাহিদবৃন্দের সহযোগিতায় ইংরেজদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর W.W. Hunter তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Indian Musalman’ গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন, “তারা অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদরা ইংরেজ সৈন্যকে কবর দিয়েছিল প্রতিটি বালুকায়।”

“দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান” গ্রন্থের ভাষ্যনুযায়ী – বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জোর তৎপরতা শুরু হয়। এতে ইংরেজ সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও দলের কর্মীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ব্যাপক

ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহর, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা শাওকত আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকেও গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে। এসময় মাওলানা সিন্ধীও এই ধরপাকড়ের আওতায় পড়বেন এই অনুমান করে শায়খুল হিন্দ (রহঃ) সিন্ধীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি কাবুলের পথ ধর আর আমি হিজাজের পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। দু'জনেই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে দু'দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

শায়খুল হিন্দ (রহঃ) উদ্দেশ্য ছিল হিজাজের পথে তুরস্ক পৌঁছা এবং তুরস্ক কর্তৃক ভারত আক্রমণের চুক্তিতে চুড়ান্ত করা। আর উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল; কাবুল সরকারকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য চুড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা। তাছাড়া আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এর ছাত্র ও ভক্তদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা। আফগানিরা ছিল স্বাধীনচেতা ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি। কিন্তু উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ ছিল বিচ্ছিন্নতার শিকার। বলিষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেরকে সংগঠিত করতে না পারলে ইংরেজ বিতাড়নে একটি বলিষ্ট শক্তি হিসাবে তাদেরকে কাজে লাগানো সম্ভবপর ছিল প্রচুর। এতদুভয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শায়খুল হিন্দ (রহঃ) সিন্ধীকেই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাক্তি মনে করেছিলেন।

এদিকে শায়খুল হিন্দের নির্দেশানুসারে মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) আব্দুল্লাহ, ফতেহ মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ আলী এই তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা পাসপোর্টে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে কাবুলের পথে যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি আফগান সীমান্তে পৌঁছান। পরে মাওলানা মনসুর আনসারী উরফে মুহাম্মাদ মিয়াকেও কাবুলে প্রেরণ করা হয়। এ সময় স্বাধীনতাকামী বহু ভারতীয় ব্যক্তিকে কাবুলে অবস্থানরত দেখতে পান। কাবুলে পৌঁছে আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহ খান, মুঈনুস সুলতানাত এনায়েত উল্লাহ খান ও নায়েবুস সুলতানাত সর্দার নাসরুল্লাহ খানের সাথে দেখা করেন।

বাদশাহ সিন্ধীর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভারত স্বাধীনতার পক্ষে সেখানে কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং তাঁকে তুর্কী জার্মান মিশনের সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে একযোগে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তুর্কী জার্মান মিশনের প্রতিনিধি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লার সাথে পরিচিত হওয়ার পরে সিন্ধী কাবুলে একটি 'অস্থায়ী ভারত সরকার' গঠন করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন । রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী ও সিন্ধীকে ভারতমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী করে এই অস্থায়ী সরকারের অবকাঠানো ঘোষণা করা হয় । কিন্তু সিন্ধী তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অচিরেই অস্থায়ী সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।

এই অস্থায়ী সরকারে কতিপয় তুর্কী ও জার্মানীও ছিল । কিছুকালের মাঝেই জার্মান সদস্যদের সাথে মিশনের কর্মসূচীর ব্যাপারে ভারতীয়দের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এই মতানৈক্য নিরসনের জন্য সিন্ধী আফগান সরকারে উপস্থিতিতে মিশনের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ট ও যুক্তিযুক্ত একটি কর্মসূচী পেশ করে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। তাছাড়া এই অস্থায়ী সরকারে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটুকু থাকবে এ নিয়ে মিশনের হিন্দু মুসলমান সদস্যদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ দেখা দিলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হিন্দুদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তারাই মিশনের প্রতিনিধিত্ব করবে বলে রায় দেন। সিন্ধী এ সময়ও মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় উপনীত হন, যার ফলে মহেন্দ্র প্রতাপ মুসলমানদেরকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সম্মত হতে বাধ্য হন । মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা আনসারী ও মাওলানা সায়ফুর রহমানের পরামর্শে আফগানিস্তানে অবস্থানরত স্বাধীনতাকামী আলেম উলামা ও নওজোয়ান ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এবং শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এর সে দেশীয় শিষ্যদের সমন্বয়ে 'জুনুদে রব্বানী' নামে একটি সশস্ত্র সংগ্রামী বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন, যারা তৃতীয় আফগান যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল । পরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে এ বাহিনীকে তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

আফগানিস্তানে যে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন হয়েছে সে খবর ব্রিটিশ সরকারের কাছে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক সরকারের পতন হয় এবং খলিফা পদচ্যুত হন। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তুরস্কের সুলতান আর মুসলমান জগতের খলিফা নন, এই মর্মে কিছু মুসলিম আলেমকে খরিদ করে তারা ফতোয়া জারি করে এবং সেই ফতোয়ার শায়খুল হিন্দকে সই করতে বলা হয় কিন্তু শায়খুল হিন্দ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

শায়খুল হিন্দ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল যাবার ইচ্ছা করেন। তিনি জানতেন ব্রিটিশরা তাঁকে সেখানে যেতে দেবে না তাই তিনি কৌশলে হজ করতে যাবার কথা বলেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে হুকুম আসে শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য।

রেশমী রুমালের আন্দোলন (Silk Letter Movement)

শায়খুল হিন্দ হজ করার অজুহাতে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারাপুরীকে নিয়ে মক্কা মদীনার পথে রওয়ানা হয়। শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করতে এসে ব্রিটিশ পুলিশ বিপাকে পড়ে গেল। শায়খুল হিন্দকে এগিয়ে দেবার জন্য হাজার হাজার ছাত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। গ্রেফতারী পরোয়ানা হাতে নিয়েও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে না। প্রতিটি ষ্টেশনেই লোকে লোকারণ্য। কিভাবে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করবে? ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বোম্বাইয়ে গ্রেফতারের কথা বলে কিন্তু সেখানেও অবস্থা অনুরুপ। শায়খুল হিন্দ জাহাজে উঠে গেলেন কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারল না। ব্রিটিশ সরকার শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য এডেন সরকারকে তার প্রেরণ করেন। যখন এডেন সরকারের কাছে তার পৌঁছে তখন শায়খুল হিন্দ জেদ্দায় পৌঁছে গেছেন।

এইভাবে শায়খুল হিন্দ ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রেফতারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর হিজাজে পলায়ন করেন। এবং সেখান থেকে তিনি

ইস্তাম্বুল পৌঁছেন। মক্কা – মদীনা তথা ছিল তখন তুরস্কের অধীনে। হিজাজে পৌঁছে তিনি মদীনার তুর্কী গভর্ণর গালিব পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শায়খুল হিন্দের বক্তব্য শুনে গালিব পাশা সন্তুষ্ট হন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সব ধরণের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। গভর্ণর গালিব পাশা শায়খুল হিন্দকে রেশমী রুমালে লেখা একখানি পত্র দেন। শায়খুল হিন্দ তুর্কী যেতে চাইলেন। গালিব পাশা তাতে রাজী হয়ে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল যাবার সব ব্যবস্থা করে দেন এবং আনোয়ার পাশার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মদীনার গভর্ণর বসরী পাশাকে নির্দেশ দেন।

এই সময় শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) গালিব পাশার কাছে আরো দুটি চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এর একটি ছিল ভারতবর্ষ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ যথা আফগানিস্তান ও সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গালিব পাশার পক্ষ থেকে আহ্বান। ইতিহাসে একে ‘গালিবনামা’ নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর অপর পত্রটি ছিল আফগান সরকারের প্রতি যাতে শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এর প্রস্তাবনা মাফিক তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার তুর্কী সরকারের অনুমোদনের কথা উল্লেখ ছিল এবং এ চিঠিতে আফগান সরকারকে এ মর্মে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের কোন অংশ হস্তক্ষেপ করবে না। ইতিহাসে একে ‘গালিব চুক্তিনামা’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গালিব পাশার চিঠি নিয়ে শায়খুল হিন্দ (রহঃ) মদীনায় পৌঁছালেন। তখন মদীনার গভর্ণর শায়খুল হিন্দকে জানালেন যে, আনোয়ার পাশা নিজেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা জিয়ারতের জন্য মদীনা আসছেন। অতএব তাঁর তুরস্ক যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মদীনায় থাকতেন তাঁর প্রিয় ছাত্র শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী। শায়খুল হিন্দের এই ছাত্র এত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন যে তিনি মসজিদে নববীর পাশে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসের গ্রন্থ বুখারী শরীফ ১৮ বছর আরবী ভাষায় পড়িয়েছেন। তাঁরই উস্তাদ শায়খুল হিন্দ তাঁর

কাছে এলে তিনি উস্তাদকে খুবই আদরযত্ন করেন। শায়খুল হিন্দের ইচ্ছা ছিল সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ইস্তাম্বুল যাবেন।

যথার্থই কিছুদিনের মাঝে তুরস্কের সমর সচিব আনোয়ার পাশা এবং সামরিক অধিনায়ক জামাল পাশা হিজাজে আগমন করলে মদীনার গভর্ণর আনোয়ার পাশার সাথে শায়খুল হিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। শায়খুল হিন্দ তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আনোয়ার পাশাও শায়খুল হিন্দকে সব ধরণের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনিও শায়খুল হিন্দের এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এই মর্মে তাঁদের মাঝে একটি চুক্তিও সাক্ষরিত হয়। এই সময় শায়খুল হিন্দ আনোয়ার পাশার কাছ থেকেও তিনটি চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মাঝে চুক্তি সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি ছিল মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাতে শায়খুল হিন্দকে সর্বাত্মক সহায়তা দানের জন্য আনোয়ার পাশার পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান। তৃতীয় পত্রটি ছিল আফগান সরকারের প্রতি, যাতে আফগানের সম্মতি থাকলে তুর্কী সরকার ভারত আক্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। আফগান সরকারকে লেখা আনোয়ার পাশার তৃতীয় চিঠিটির মর্ম ছিল এরুপ যে, "আফগান সরকার সম্মতি থাকলে ১৯১৭ ইংরেজী সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটাবে।"

এদিকে শায়খুল হিন্দ মক্কায় থাকার সময় তুর্কী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরে যান যে, তাঁর এবং মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর গোপন কুটনৈতিক তৎপরতার ব্যাপারে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানতে পেরে গেছে। তাই তিনি আর নিজে এলেন না বরং তিনি একটি কাঠের বাক্স বানালেন এবং সেই বাক্সের তক্তা চিরে তার মধ্যে চিঠিগুলো রেখে দিয়ে তা যুক্ত করে দেন। এতে কারো সন্দেহ করার আর অবকাশ রইল না। তারপর তিনি বাক্সটিতে কাপড় ভরে দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেন। মুজাফফর নগর জেলার মাওলানা হাদী হাসান ও হায়দ্রাবাদের হাজি শাহ বখস মারফত বাক্সটি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তাঁরা যেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে উক্ত চুক্তিনামার

কপিগুলো বের করে মুজাফফর নগরের অধিবাসী হাজি নুর হাসানকে দিয়ে বলেন, তিনি যেন আহমদ মির্যা নামক ফটোগ্রাফার দ্বারা উক্ত তুর্কী সামরিক চুক্তিনামার কাগজগুলো ফটোকপি করে নির্দেশিত স্থানে বিলি করেন। চিঠিভর্তী কাঠের সিন্দুক নিয়ে তাঁর দুই অনুসারী মাওলানা হাদী হাসান ও হাজি শাহ বখস বোম্বাই বন্দরে পৌঁছলেন। ব্রিটিশরা ভাবল হয়ত শায়খুল হিন্দ স্বয়ং বোম্বাই বন্দরে এসেছেন। তাই তারা গ্রেফতার করার জন্য বন্দরে এসে জড় হয়ে গেল। জাহাজে শায়খুল হিন্দের একজন ভক্তও ছিলেন, তিনি মাওলানা হাদী হাসানকে গোপনে ডেকে বললেন, "গোপনীয় কিছু নিয়ে এসে থাকলে আমায় দিন, আমি পার করে দেব।" মাওলানা হাদী হাসান তাঁর বাক্সটি কিছু মালের সাথে পার্সেল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেন। এদিকে পুলিশ খানাতল্লাসী করেও শায়খুল হিন্দকে বন্দরে খুঁজে পেল না। পাবে কি করে? শায়খুল হিন্দ তো আগে থেকেই তুর্কী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তৎপরতার ব্যাপারে জেনে গেছিলেন এবং হাদী হাসানকে দিয়ে চিঠিগুলি ভারতে পাচার করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন যা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানত না। শায়খুল হিন্দের এ এক বিরাট রাজনৈতিক তৎপরতার নমূনা। এদিকে পুলিশ জাহাজে শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করতে না পেরে হতাশ। তাই তারা শায়খুল হিন্দকে না পেয়ে মাওলানা খলিল আহমদ দেওবন্দী ও মাওলানা হাদী হাসানকে গ্রেফতার করে এবং ব্যাপকভাবে তাদের তল্লাশী করে। তাঁদেরকে বিভিন্ন শারিরিক নির্যাতনও করা হয় এবং বিভিন্ন প্রলোভনও দেখানো হয়। কিন্তু নির্যাতন ও প্রলোভনে কোন লাভ হল না, তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা দেড় মাস পর তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়।

এই ঘটনার আরও প্রায় দেড় মাস পর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী শায়খুল হিন্দের উক্ত সামরিক চুক্তির কথা জানতে পেরে যায়। একদিন মাওলানা হাদী হাসানের ঘরে যখন মাওলানা মুহাম্মাদ নবী উক্ত দুটি চুক্তিনামা সিন্দুক থেকে বের করেন ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ মাওলানা হাদী হাসানের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। পুলিশের আগমনের টের পেয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ নবী তৎক্ষনাৎ তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে ওয়েস্টকোটটি পুরুষদের কামরায় লুকিয়ে রাখেন। গোয়েন্দা পুলিশ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সারা ঘর চিরুনীতল্লাশী করলেও কিন্তু ওয়েস্টকোটটির উপর তাদের দৃষ্টি পড়েনি। সারা ঘর জুড়ে

তল্লাশী করে বিভিন্ন জিনিসপত্র নষ্ট ও ভাঙ্গাচুরা করলেও গোয়েন্দারা কোন ফললাভ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

এরপর সেই চিঠিগুলো হাজি নুর হাসানের নিকট পৌঁছায় । তিনি সেগুলিকে ফটোকপি করার জন্য দিল্লীর ফটোগ্রাফার আহমদ মির্যার নিকট যান। আহমদ মির্যা যখন তাঁর স্টুডিওতে চুক্তিনামাগুলোকে ফটোকপি করছিলেন, ঠিক সেই সময় আবার ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী তাঁর স্টুডিও ঘেরাও করে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি চুক্তিনামাগুলোকে মুহুর্তের মধ্যে টেবিলের নিচে রাখা পানির থালায় রেখে দেন। এখানেও গোয়েন্দারা সার স্টুডিও জুড়ে চিরুনী তল্লাসী করলেও কিন্তু থালার উপর তাদের দৃষ্টি পড়েনি। শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা বাহিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। বলা হয় উক্ত ঘটনা দুটি শায়খুল হিন্দের কারামত।

শায়খুল হিন্দের নির্দেশ মতো হাজি নুর হাসান চুক্তিনামাগুলোকে ফটোকপি করে আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। অতঃপর শায়খুল হিন্দের পক্ষ থেকে মুজাফফর নগর জেলার রাথেড়ী মৌজার অধিবাসী জনাব নুরুল হাসানকে উক্ত ফটোকপিগুলো যেসব নির্দিষ্ট স্থানে বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। আনোয়ার পাশার তৃতীয় চুক্তিনামায় এও উল্লেখ করা ছিল যে, "আফগান সরকার সম্মতি থাকলে ১৯১৭ ইংরেজী সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটাবে।"

আফগানকে লেখা এই পত্রটি মাওলানা হাদী হাসান হিজাজ থেকে নিয়ে এসে আফগানিস্তানের অবস্থানরত অস্থায়ী ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে দেন। কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মাওলানা সিন্ধীর নেতৃত্বে এ চিঠি নিয়ে এসে আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন। বাদশাহ পররাষ্ট্র বিষয়ে ব্রিটিশদের সমর্থক হওয়ার কারণে তিনি এ বিষয়টি স্বতঃস্ফুর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র সর্দার এনায়েত উল্লাহ ও সর্দার আমান উল্লাহ এবং তাঁর ভাই ভাবী আফগান সম্রাট নসরুল্লাহ খানসহ সরকারের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তিবর্গ ও দেশের জনসাধারণের আগ্রহের কারণে তিনি বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই পরিস্থিতির চাপে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী অস্থায়ী ভারত সরকারের সাথে তিনি এ মর্মে একটি চুক্তি সাক্ষর করেন। সেই চুক্তির বক্তব্য ছিল, “আফগান সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন, তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার ব্রিটিশ সরকারকে এ মর্মে কৈফিয়ত দিবে যে, সীমান্তের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল, যে কারণে তুর্কীদের ঠেকানো সম্ভব হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে এ ব্যাপারে তার কোনরুপ আপত্তি থাকবে না।”

এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) ও আমীর নসরুল্লাহ খান উক্ত চুক্তিনামার ব্রিটিশদেরকে আক্রমণের তারিখ সহ আরবীতে অনুবাদ করেন। অতপর একজন দক্ষ কারিগর দিয়ে রেশমী রুমালের গায়ে সেই আরবী ভাষ্য সুতোর সাহায্যে অঙ্কিত করে, সেটিকে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এর নিকট পাঠনোর ব্যবস্থা করেন। এই অভিনব পন্থা অবলম্বনের মূল হেতু ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর কড়া তল্লাসী এড়ানো এবং তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খবরটি নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছানো।

এবার শায়খুল হিন্দ নিজেকে ইয়াগীস্তানে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রুশ সরকার সমগ্র আফগানিস্তানের পথ অবরোধ করে ফেলেছে। অতএব শায়খুল হিন্দকে হেজাজ কিংবা তুর্কী সাম্রাজ্যের কোন এক স্থানে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হল।

কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় অন্তর্বর্তী সরকারের একটি একটি ডেপুটেশন একটি ইস্তাম্বুলে এবং একটি জাপানে পাঠাকবার সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়। মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধীর পরামর্শক্রমে মিঃ আব্দুল বারী ও ডাঃ সুজাউদ্দৌল্লাহ খান ইস্তাম্বুল মিশনে এবং ডাঃ মথুরা সিং ও সেখ আব্দুল কাদের খান জাপান মিশনে।

কিন্তু ইরানে পৌঁছানো মাত্র ইংরেজরা ইস্তাম্বুল মিশনকে এবং রুশ সরকার যাত্রাপথে জাপান মিশনকে গ্রেপ্তার করে। ধরা পড়ে স্যর মোহাম্মদ শফি সমস্ত রহস্য ফাঁস করে দেন। মথুরা সিং এর ফাঁসী হয়। এই মথুরা সিং আগে থেকেই ব্রিটিশ ভারতে বোমা ফেলার কেসের আসামী ছিলেন। তাই তাঁকে গ্রেফতারের পর ফাঁসীতে ঝোলানো হয়। শায়খুল হিন্দ গালিব পাশার পত্র সহ মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া আনসারীকে ভারতে প্রেরণ করেন। দেশে ফিরে দেখেন রেশমী পত্রের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি ছদ্মবেশে ইয়াগীস্থান যাত্রা করেন এবং পরে কাবুল কাবুলে উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ আব্দুল হককে মাহমুদুল হাসানের নিকট প্রেরণ করেন। এই আব্দুল হক ছিলেন একজন নও-মুসলিম এবং শায়খুল হিন্দের একনিষ্ট ভক্ত। আব্দুল হক আগে থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি আফগান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কথা ছিল এই রুমালটি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট পৌঁছে দেবেন।

এদিকে আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহ খান প্রচুর টাকার বিনিময়ে নিজেকে ব্রিটিশদের হাতে বিক্রি করে দেন এবং গোপনে রেশমী রুমালের ব্যাপারে সব তথ্য ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দেয়। ফলে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয় এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ব্রিটিশ গোয়েন্দা আব্দুর রহীমের বাড়ি তল্লাশী চালায় এবং রেশমী রুমালের চিঠিটি উদ্ধার করে ফেলে। আব্দুর রহীম কোন মতে পুলিশের নজর এড়িয়ে গোপনে পলায়ন করেন এবং চিরতরে আত্মগোপন করেন। ফলে এ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার শুরু হয়।

শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এর ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার ব্যাপারে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আগে থেকেই জেনে ফেলেছিল তাই তারা ভারতে থাকাকালীন শায়খুল হিন্দের ব্যাপারে সন্দীহান ছিল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তারা শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অবশ্য মাওলানা আব্দুল হক হক্কানীর নামে প্রচারিত তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে একটি ফতোয়ায় সই না করার জন্য ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সন্দের আরও গাঢ় হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁকে যে কোন সময় বন্দী করা যেতে পারে এ আশঙ্কা করেই ডাঃ আনসারী ও মাওলানা

আবুল কালাম আযাদ তাঁকে দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে যখন শায়খুল হিন্দ হেজাজের পথে রওয়ানা হলেন তখন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাঁকে পর্যায়ক্রমে বোম্বাইয়ে, এডেনে, জেদ্দায় গ্রেফতার করার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। জাহাজ থেকে অবতরণের পর সি আই ডি পুলিশের একটি দল হাজিদের বেশ ধারণ করে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের এজেন্ট সিআইডিদেরকে গ্রেফতার করে ফেলে। এবং তুর্কী পুলিশের তত্ত্বাবধানে শায়খুল হিন্দকে হজ সমাপন করিয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এভাবে আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় মুজাহিদ বান্দাকে রক্ষা করেন।

কিন্তু রেশমী রুমাল যখন ব্রিটিশদের হস্তাগত হয় তখন তাদের আর কোন সন্দেহই থাকেনি। ফলে ব্রিটিশরা শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

রেশমী রুমালকে কেন্দ্র করে এত বড় আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছিল তাই ইতিহাসে এটি 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' (Silk Letter Movement) বলে বিখ্যাত।

এই রেশমী রুমালে তিনটি চিঠি লেখা হয়েছিল। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী প্রথম পত্রটি লিখেছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম সিন্ধীর নামে। ঐ পত্রটি ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫ ইঞ্চি প্রস্থ ছিল। মাওলানা সিন্ধী ঐ পত্রে মাওলানা আব্দুর রহীম সিন্ধীকে হুকুম দিয়েছিলেন যে তিনি যেন অপর পত্রটি শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছে দেন। দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর নামে। এই পত্রটি ছিল ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৮ ইঞ্চি প্রস্থ। তৃতীয় পত্রটি লিখেছিলেন সরাসরি শায়খুল হিন্দের নামে। এই পত্রটি পত্রটি ছিল ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১০ ইঞ্চি প্রস্থ। মূলতঃ তিনটি পত্রই শায়খুল হিন্দকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে সেগুলো তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

১ম পত্রঃ মাওলানা আব্দুর রহীম সিন্ধীর নামে লেখা প্রথম চিঠির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ছিলঃ

(ক) এ চিঠি পবিত্র মদীনায় অবস্থানরত হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।

(খ) শায়খুল হিন্দকে পত্রের মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবেও সতর্ক করে দিতে হবে যে, তিনি যেন কাবুলে আসার চেষ্টা না করেন।

(গ) শায়খুল হিন্দ এ বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত থাকেন যে, মাওলানা মনসুর আনসারী এবার হজে যেতে পারছেন না।

(ঘ) আব্দুর রহীম সিন্ধী যে ভাবেই হোক কাবুলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর সাথে দেখা করবেন।

(ঙ) শায়খুল হিন্দের জন্য লিখিত চিঠি মদীনায় পৌঁছাল কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে কাবুলে জানাবেন।

পত্রটি লিখার তারিখ ছিল – ৮ রমযান, ৯ জুলাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২য় পত্রঃ দ্বিতীয় পত্রটি ভারতের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। এতে মুজাহিদগণকে নিয়ে প্রস্তাবিত ‘জুনুদুল্লাহ’ বা মুক্তিফৌজ গঠনের পূর্ণ বিবরণ ছিল। জুনুদুল্লাহ মুজাহিদগণের ১০৪ জন অফিসারের এবং তাঁদের বেতন ভাতার কথা উল্লেখ ছিল। মুজাহিদ অফিসারগণের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা মুজাহিদগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষন দেবেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগাবেন। এও উল্লেখ করা হয় যে, এসব মুজাহিদকে হিন্দুস্থান সৈন্যবাহিনীতে ভর্তী করা হবে। ঐ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র হবে মদীনায়। শায়খুল হিন্দকে ঐ বাহিনীর প্রধান করার কথা ছিল। তিনজন পৃষ্ঠপোষক বারজন জেনারেল এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম ছিল। সেনাপতিদের অধীন কেন্দ্রসমূহ হবার কথা ছিল কনস্টান্টিনোপল, তেহরান এবং কাবুল। কাবুলের সেনাবাহিনীর প্রধান হবার কথা ছিল মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর। পত্রে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কর্মোদ্দীপনা, জার্মান মিশনের আগমন ও তাদের কর্মতৎপরতা, অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রুশ, জাপান ও তুরস্কে মিশন প্রেরণার পূর্ণ বিবরণ ছিল। পত্রে শায়খুল হিন্দকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি যেন এসব বিষয়য়ের তথ্য তুরস্কের উসমানীয়া খলিফার নিকট পৌঁছে দেন।

৩য় পত্রঃ তৃতীয় পত্রটির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এটি লেখা হয়েছিল মাওলানা মনসুর আনসারীর পক্ষ থেকে। এ চিঠিতে তিনি হজ সম্পাদনা শেষে হেজাজ থেকে ভারতে ফিরে এসে পরবর্তী আন্দোলনের হাল – অবস্থা এবং কোন কোন নেতা কর্মী ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ভয়ে নিরুৎসাহী ও নিস্ক্রিয় রয়েছেন, তা উল্লেখ করেন। চিঠিতে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও আমার পক্ষে এবার হেজাজ যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি জেজাজ থেকে যে, 'গালিবনামা' বহন করে এনেছিলেন তা বন্ধুদেরকে দেখানো হয়েছে এবং উপজাতীয় এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। মুজাহিদগণকে গালিবনামা দেখানোতে তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এখন যুদ্ধ করছে। সীমান্তের লৌহমানব হাজি তুরঙ্গযায়ী এখন 'মেহমন্দ' এলাকায় অবস্থান করেছেন। পত্রে তুর্কী – জার্মান মিশনের আগমন এবং তাদের ব্যর্থতার কারণও উল্লেখ করা হয়। পত্রগুলি রেশমী খোদিত করে লিখানোর পর মাওলানা সিন্ধী সেগুলো মদীনায় শায়খুল হিন্দের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এ কাজের জন্য তিনি শায়খ আব্দুল হক নামক একজন নও-মুসলিমকে বাহক হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি বেনারসের এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজীতে এম এ পাশ করেন। শায়খুল হিন্দের শাগরিদ এবং একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি মুহাজির ছাত্রদের সাথে কাবুল সীমান্ত, পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুর হয়ে মুলতান পৌঁছান। আব্দুল হক আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য ছিল, কাপড়ের ব্যবসা এবং তার দীর্ঘদীনের বন্ধু ব্রিটিশ অনুগত চর রব নাওয়াজ এর দুই ছেলের খবরাখবর জানা। ঐ দুই ছেলেও মুহাজির ছাত্রদের দলভুক্ত হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছে ছিলেন এবং জুনুদুল্লাহ'র সদস্য হয়ে কাজ করছিলেন। আব্দুল হকের ব্যবসার কাপড়ের মধ্যে রেশমী রুমালটি লুকিয়ে রাখা হয়। আব্দুল হকের প্রতি সিন্ধীর নির্দেশ ছিল, তিনি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট রেশমী রুমালটি পৌঁছে দেবেন এবং আব্দুর রহীমকে বলে দেবেন, তিনি যেন হজ করতে যেয়ে শায়খুল হিন্দ মাহজমুদুল হাসানের নিকট পত্রটি পৌঁছে দেন অথবা তিনি নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আব্দুল হক মাওলানা সিন্ধীর রুমালটি কাবুল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন। এখানে এসে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কড়াকড়ি পরীক্ষা – নিরীক্ষা দেখে

তিনি তা আর বহন করার সাহস করেন নি। বরং বাহাওয়ালপুরের বিখ্যাত পীর মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ এর নিকট পত্রগুচ্ছিত কোটটি আমানত হিসাবে রেখে আসেন, সিন্ধুতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আব্দুল হক রব নাওয়াজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অসম্ভব ভীত ছিলেন। তাই ভারতে ফিরে এসে তিনি রব নাওয়াজের দেশত্যাগী দুই ছেলের শুভাশুভ সংবাদ জানালেন, সাথে সাথে রব নাওয়াজের ধমকানীতে কাবুলে স্বদেশত্যাগীদের কর্মতৎপরতা, আন্দোলন, সীমান্ত এলাকায় হামলা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ভারতীয়, রাজন্যবর্গের নিকট জার্মান সম্রাটের আশ্বাসবাণী সম্বলিত যে চিঠি লিখেছেন এবং রাজন্যবর্গকে যে এও লিখেছেন, সীমান্তের মুজাহিদগণ যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশের উপর আক্রমণ করবে, তখন যেন বিদ্রোহ করে, এজন্য মহারাজা ন্যায়পাল ও মহারাজা বড়দাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, এসব তথ্য এবং কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কেও বিস্তারিত বলে দিলেন। আব্দুল হক তখন রব নাওয়াজের ধমকানীতে ভীত হয়ে সিন্ধীর দেওয়া রেশমী কাপড়ের চিঠিগুলি যে কোটের আস্তরে সেলাই করা ছিল সে কোটটি বাহাওয়ালপুরের মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদের নিকট থেকে নিয়ে এসে রব নাওয়াজের হাতে পাঠিয়ে দেন।

রব নাওয়াজ ছিলেন ব্রিটিশদের অনুচর ও ক্রীতদাস। তার ভিতর দু'ছেলের ত্যাগের কারণে ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল। তাই ঐ চিঠি ও কোট হাতে এলে ব্রিটিশ সরকারের কৃপাদৃষ্টির আশায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রধান স্যার মাইকেল এডওয়ার্ড – এর হাতে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠির যাবতীয় বিষয় অবগত করায়। ব্রিটিশের পক্ষ থেকে রব নাওয়াজের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করে। রব নাওয়াজের এই লজ্জাজনক ভূমিকা দেশবাসীর জন্য স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা।

রব নাওয়াজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রেশমী রুমালের সমস্ত নথিপত্র ও মুজাহিদদের সমস্ত গোপন তথ্য ব্রিটিশদের হাতে এসে যায় এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। যাকেই সন্দেহ হয় তাকেই গ্রেফতার করা হয়। ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নেয় এবং প্রতি রাতে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে। সারা দেশজুড়ে চলে পাকড়াও অভিযান। উত্তর প্রদেশ, দিল্লী,

সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট, বিহার ও বাংলা প্রদেশের অবস্থা ছিল নরককুণ্ড উল্লেখযোগ্য শহর আলীগড়, দেওড়িয়া, মীরাট, সুরাট, কলকাতা, গয়া, রেঙ্গুন (বার্মা), কারিহাট, মুজাফফর নগর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বিজনৌর, আজমীর, সিমলা, কসুর, বোম্বাই, সাহারানপুর, দেওবন্দ, রায়পুর, সিয়ালকোট, মুরাদাবাদ, পেশওয়ার, ভাগলপুর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, ভুপাল ও গাঙ্গুহ শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে পুলিশী তল্লাসী ও ধরপাকড় শুরু হয়। পুলিশ অসংখ্য স্থানে রেড দেয়। ২৩০ জনের বিরুদ্ধে শাসন উৎখাত ও সে উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য প্রার্থনার অভিযোগ মুকাদ্দামা দায়ের করা হয়।

রেশমী রুমাল আন্দোলনে (Silk letter Movement) C.I.D Report No 2824, - 1916 খ্রীষ্টাব্দে যেসব লোকের নাম নথিভুক্ত ছিল তাঁরা হলেন যথাক্রমেঃ-

১) অর্জুন সিং, ২) কালা সিং, (৩) মথুরা সিং, (৪) রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, (৫) আব্দুল কাদের আযাদ, (৬) ইবরাহীম সেখ, (৭) ইবরাহীম সাহেব, (৮) ইবরাহীম মৌলবী, (৯) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, (১০) আবু মুহাম্মাদ, (১১) আহমদ জান, (১২) আহমদ জান মৌলবী, (১৩) আহমদ হাসান, (১৪) আহমদ হুসেন, (১৫) আহমদ আলী, (১৬) আহমাদুল্লাহ শাহ, (১৭) ইসমাইল, (১৮) ইসমাইল হাফেজ, (১৯) ইস্তাপা করীম, (২০) আব্দুল্লাহ নাওয়াজ, (২১) ইমদাদ হোসেন, (২২) আমীর শাহ, (২৩) আনসারী ডাক্তার, (২৪) আজিজুদ্দীন, (২৫) আব্দুল আজীজ, (২৬) আব্দুল আজীজ মৌলবী, (২৭) আব্দুল আজীজ শাইখ, (২৮) আব্দুল বারী, (২৯) আব্দুল হাই, (৩০) আব্দুল হামীদ, (৩১) আব্দুল হক, (৩২) আব্দুল হক শাইখ, (৩৩) আব্দুল হামাত, (৩৪) আব্দুল করীম, (৩৫) আব্দুল করীম, (৩৬) আব্দুল খালিক, (৩৭) আব্দুল্লাহ আনসারী, (৩৮) আব্দুল হারুল, (৩৯) আব্দুল্লাহ ইসাদী, (৪০) আব্দুল্লাহ মৌলবী, (৪১) আব্দুল্লাহ মৌলবী সীন, (৪২) আব্দুল্লাহ শাইখ, (৪৩) আব্দুল লতিফ, (৪৪) আব্দুল লতিফ হাজি, (৪৫) আব্দুল্লাহ মৌলবী, (৪৬) আব্দুল হামীদ, (৪৭) আব্দুল মুহিদ, (৪৮) আব্দুল কাদের, (৪৯) আব্দুল কাদের মৌলবী, (৫০) আব্দুল কাদের শাইখ, (৫১) আব্দুর রহমান, (৫২) আব্দুর রাযযাক, (৫৩) আব্দুল সালাখ, (৫৪) আব্দুল ওহীদ, (৫৫) আব্দুর রহীম, (৫৬) আব্দুর রহীম মৌলবী, (৫৭) আব্দুর রহীম শাইখ, (৫৮) আব্দুর রহমান,

(৫৯) আব্দুর রহমান পাঞ্জাব, (৬০) আব্দুর রহমান (জলন্ধর), (৬১) আব্দুর রহমান শাইখ, (৬২) আব্দুর রশীদ, (৬৩) আব্দুর রাজ্জাক, (৬৪) আব্দুল সালাখ, (৬৫) আলী মোহাম্মাদ, (৬৬) আনিস আহমদ, (৬৭) আনওয়ার শাহ, (৬৮) ওজাইর গুল, (৬৯) আজীজুর রহমান, (৭০) বাবরাহ মোল্লা, (৭১) রবকতুল্লাহ মৌলবী, (৭২) ফকরী শাহ, (৭৩) ফতেহ মুহাম্মাদ, (৭৪) ফজলে ইলাহী, (৭৫) ফজল মাহমুদ, (৭৬) ফজলে রব, (৭৭) ফজলু মিঁয়া, (৭৮) ফজলুর রহমান, (৭৯) গালিব পাশা, (৮০) গোলাম হোসেন, (৮১) গোলাম মুহাম্মাদ, (৮২) গোলাব মুহাম্মাদ মাওলানা, (৮৩) গোলাম নবী, (৮৪) গোলাম রসুল, (৮৫) হাবীবুল্লাহ গাজি, (৮৬) হাবীবুর রহমান, (৮৭) সাঈয়েদী হাদী হাসান, (৮৮) হাজী তুরঙ্গময়ী, (৮৯) হাকিম জসিমুদ্দীন, (৯০) হাকিম আব্দুর রাজ্জাক, (৯১) হামদুল্লাহ মৌলবী, (৯২) হানিফ মৌলবী, (৯৩) হুরমাতুল্লাহ, (৯৪) হাশিম, (৯৫) হসরত মুহানী, (৯৬) হায়দর হোসেন, (৯৭) হুসাইন আহমদ মাদানী, (৯৮) মুহাম্মাদ জলীল, (৯৯) জন সাহেব ডোডা, (১০০) করিম বখশ, (১০১) কাজেম, (১০২) খলিল আহমদ, (১০৩) খান মুহাম্মাদ, (১০৪) খোদা বখশ, (১০৫) যোশী মুহাম্মাদ, (১০৬) কোহেস্তানী মোল্লা, (১০৭) মাহবুব খান, (১০৮) রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, (১০৯) মাহমুদ হাসান, (১১০) মাহমুদুল হাসান (দেওবন্দী), (১১১) মাওলানা মুহাম্মাদ মাসুদ, (১১২) মথুরা সিং, (১১৩) মতলুবুর রহমান, (১১৪) সাইফুর রহমান, (১১৫) সেলিম খান, (১১৬) মাওলানা সালাউল্লাহ, (১১৭) জমিরুদ্দীন আহমদ, (১১৮) কাজী জিয়াউদ্দীন, (১১৯)মাওলানা মাজহারুদ্দীন, (১২০) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (১২১) মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসীন, (১২২) শাঃ উলামা মুহাম আহমদ, (১২৩) মুহাম্মাদ আকবর, (১২৪) মুহাম্মাদ আলী, (১২৫) মুহাম্মাদ আলী, (১২৬) মুহাম্মাদ আলী, (১২৭) মুহাম্মাদ আসলাম, (১২৮) মুহাম্মাদ হাসান, (১২৯) মোঃ মুহাম্মাদ হাসান, (১৩০) মুহাম্মাদ হাসান, (১৩১) মুহাম্মাদ হাসান, (১৩২) মুহাম্মাদ হোসেন, (১৩৩) মুহাম্মাদ ইলাহী, (১৩৪) হাকিম মুহাম্মাদ, (১৩৫) মুহাম্মাদ ইসমাইল শহীদ, (১৩৬) মৌ মনসুর মুহাম্মাদ মিঁয়া, (১৩৭) মুহাম্মাদ মবীন, (১৩৮) মৌঃ সু সাদেক প্রমুখ।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে উক্ত ব্যক্তিদের নাম ছিল যাঁরা রেশমী রুমাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

শায়খুল হিন্দের গ্রেফতারীঃ

শায়খুল হিন্দ (রহঃ) যখন হিজাজে পৌঁছান তখন হিজাজ ছিল তুরস্কের (তুর্কী) উসমানিয়া (অটোমান) খেলাফতের অধীন। মক্কা মদীনার শাসন ক্ষমতা সুন্নী তুর্কীদের হাতে থাকার জন্য তুর্কী খেলাফত সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এই সম্মান ও শ্রদ্ধা তুর্কী খিলাফতের জন্য ছিল এক বিরাট শক্তি। সুচতুর ইংরেজরা মক্কা মদীনার শাসন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে তাদের প্রতি সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাহানুভূতিকে নষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে হিজাজে আরব জাতীয়তাবাদের ধুঁয়া তুলে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে আরবীয়দের বিদ্রোহকে উস্কে দেয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি বুঝে গেছিল আরবে তুর্কী শক্তি ক্ষমতায় থাকলে তাদেরকে তাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। শায়খুল হিন্দ যে কোন সময় তুর্কী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আফগানিস্তানের পথে অগ্রসর হয়ে ভারত আক্রমণ করতে পারেন। আক্রমণ করলেই ব্রিটিশদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এতে তাদেরকে তল্পী তল্পা গুটিয়ে ভারত থেকে পলায়ন করতে হবে। তাই তারা চেয়েছিল আরবে যেন তুর্কী শাসনের অবসান হয় এবং আরবীয়দের হাতে শাসন ক্ষমতা আসে। এই হীন ও নীচ মানসে তারা শরীফ হুসাইন নামে এক বিদ্রোহী ব্যক্তিকে একাজের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শরীফ হুসাইন ছিলেন ব্রিটিশদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রথম শ্রেণীর হীতাকাঙ্খী। বিভিন্ন উপায়ে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। শরীফ হুসাইন বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশরা শরীফ হুসাইনকে অত্যাধুনিক অস্ত্র – শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। ব্রিটিশদের মদদপুষ্ট হয়ে শরীফ হুসাইন তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মক্কায় যে তুর্কী বাহিনীর কয়েক হাজার সৈন্য ছিল তার অধিকাংশই ছিল আরবীয়। যুদ্ধ শুরু হলে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে তারা প্রভাবিত হয় এবং দলে দলে শরীফ হুসাইনের দলে যোগদান করে। ফলে হিজাজে তুর্কীদের আর টিকে থাকা সম্ভব হল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকা যোগ দিলে তুরস্ক সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। এভাবে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে শরীফ হুসাইন হেজাজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

হয়। গালিব পাশা এ সময় তায়েফে ছিলেন এবং শায়খুল হিন্দ ও তাঁর সাথী সঙ্গীরাও গালিব পাশার সাথে আলাপ আলোচনা চুড়ান্ত করার জন্য তায়েফে অবস্থান করছিলেন। অভ্যুত্থান ঘটলে গালিব পাশাকে সেখানেই গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়। শায়খুল হিন্দ তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মক্কায় পালিয়ে যেতে সফল হন। শায়খুল হিন্দ চেয়েছিলেন হেজাজ কিংবা তুর্কীস্তানের কোন স্থান অপেক্ষা ইয়াগীস্তানেই চলে যাওয়া উচিৎ।

এদিকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করে তোলার মানসে ভারত থেকে খান বাহাদুর মোবারক আলী নামে এক জনৈক ব্যক্তিকে শরীফ হুসাইনের নিকট এই মর্মে একটি চিঠিয়ে প্রেরণ করা হয় যে, হারামের (মক্কা-মদীনা) মুফতীদের দ্বারা তুর্কী খলিফাদের বিরুদ্দে একটি ফতোয়া তৈরী করিয়ে তা যেন ভারতবর্ষ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কারণ হারামের মুফতীদের ফতোয়া ভারতীয় মুসলমানদের অন্তরে তুর্কীদের ব্যাপারে বিরুপ মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাল কাজ করবে। এই ফতোয়ার উপর সই করার জন্য শায়খুল হিন্দের কাছেও পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি ইংরেজদের ডিপ্লমেশী ষড়যন্ত্র ভালভাবেই জানতেন। ফতোয়াতে সাক্ষর না করাতে শরীফ হুসাইন শায়খুল হিন্দের প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। অপরদিকে রেশমী রুমালের তথ্যের ভিত্তিতে জেদ্দায় কর্মরত ইংরেজ অফিসার কর্নেল ওয়েলসন শরীফের নিকট এ মর্মে তার বার্তা পাঠায় যে, শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করে জেদ্দায় পাঠানো হোক। শায়খুল হিন্দ পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে অন্যান্যদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে আত্মগোপন করেন।

শরীফ হুসাইনের পুলিশ বাহিনী শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তারা শায়খকে কোথাও খুঁজে পেল না। তারা শায়খকে না পেয়ে তাঁর একনিষ্ট শিষ্য ও এই আন্দোলনের বলিষ্ট নেতা মাওলানা ওযায়ের গুলকে ও মাওলানা ওয়াহীদ আহমদকে গ্রেফতার করে এবং এই মর্মে ফরমান জারী করে যে, যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে শায়খুল হিন্দকে উপস্থিত না করা হয় তাহলে তাঁর দুই সাথী মাওলানা ওযায়ের গুলকে ও মাওলানা ওয়াহীদ আহমদকে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে গুলি করে হত্যা করা হবে। এই ঘোষণা শুনে শায়খুল

হিন্দ নিজেই পুলিশের হাতে ধরা দেন। কারণ তাঁর কাছে নিজের জীবনের থেকে তাঁর দুই সাথীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী। শায়খুল হিন্দকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে বন্দী করে জেদ্দায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শায়খুল হিন্দের ছাত্র হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বৃদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে যাওয়ার জন্য লোক মারফত শরীফ হুসাইনকে জানান যে, হুসাইন আহমদই মূল অপরাধী, তাকে বন্দী করা প্রয়োজন। এই সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকেও গ্রেফতার করে বন্দী করে জেদ্দায় প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, শায়খুল হিন্দ মদীনায় যাওয়ার পর তার একনিষ্ট শিষ্য হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর বাসভবনেই অবস্থান করতেন।

গ্রেফতার করার একমাস পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তাদেরকে জেদ্দা থেকে মিশরে প্রেরণ করা হয়। চার দিন পর তাঁরা প্রণালীতে পৌঁছান। সেখান থেকে তাঁদের সশস্ত্র পাহারায় প্রথমে কায়রো এবং সেখান থেকে নীল নদের অপর প্রান্তে অবস্থিত পিরামিডের শহর জীযা'র কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর পরদিন শুরু হয় পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্বপ্রথম শায়খুল হিন্দকে দু'জন সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় ট্রেমওয়ে নগরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ শহরেই ব্রিটিশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক হেড কোয়ার্টার অবস্থিত ছিল। তিনজন জাহাজের অফিসারের উপস্থিতিতেই জবানবন্দী গ্রহণ করা শুরু হয়। গোয়েন্দা রিপোর্ট তাদের সামনেই ছিল। শায়খুল হিন্দ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় কর্কশ কন্ঠে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। অনেক দীর্ঘ ছিল এই প্রশ্নোত্তর পর্ব। অবশেষে তারা নিজেরা বলাবলী করে যে, আমাদের নিকট যে রিপোর্ট রয়েছে তাতে শায়খুল হিন্দের ফাঁসী হওয়া অনিবার্য। কিন্তু রেকর্ড পত্র পর্যাপ্ত না থাকায় আমরা সে নির্দেশ দিতে পারছিনা। এক এক করে সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শায়খুল হিন্দের সঙ্গে তখন ছিলেন শায়খুল আরবে ওয়াল আযম হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা উযায়ের গুল, মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ ও মাওলানা হাকীম নুসরত হুসাইন ফতেপুরী।

'আসীরে মাল্টা' গ্রন্থে শায়খুল ইসলামের যে পুলিশ অফিসারদের কথোপকথন হয়েছিল তা লেখা আছে। লেখা আছেঃ-

জেদ্দা থেকে কর্নেল উইলসন এঁদের ১৩৩৫ হিজরীর ১৮ই রবিউল আওয়াল সুয়েজ খালে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে কায়রোয়। এখানে জেল খানায় রাখা হয়। পরের দিন শহরের জেলখানায় শায়খুল হিন্দকে আলাদা কামরায় তিনজন ইংরেজ অফিসার উর্দুতে প্রশ্ন করতে থাকেন। এঁদের কাছে একটি ফাইল ছিল। ফাইলে শায়খুল হিন্দ সম্পর্কে রিপোর্ট ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ বেশ ক্রুদ্ধ কঠোর কিংবা ঘৃণা বশত তাচ্ছিল্য ভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন। একজন ভারতবাসীর এই স্পর্ধা দেখে তাঁরা অবাক হচ্ছিলেন।

প্রশ্নঃ আপনাকে কেন বন্দী করা হয়েছে?

উত্তরঃ ওদের ঘোষণা পত্রে সই না করার জন্য।

প্রশ্নঃ আপনি কেন সই করলেন না?

উত্তরঃ ঘোষণা পত্রটি শরীয়াত বিরুদ্ধ ছিল।

প্রশ্নঃ ভারতে আপনার সামনে মৌলবী আব্দুল হক হক্কানীর ফতোয়া পেশ করা হয়েছিল?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ তখন আপনি কি করলেন?

উত্তরঃ বাতিল করে দিলাম।

প্রশ্নঃ কেন?

উত্তরঃ শরীয়াত বিরুদ্ধ ছিল।

প্রশ্নঃ আপনি মৌলবী উবাইদুল্লাহকে চেনেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ কোথায় পরিচয় হয়েছিল?

উত্তরঃ উনি দেওবন্দে দীর্ঘদিন আমার কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

প্রশ্নঃ তিনি এখন কোথায় আছেন?

উত্তরঃ আমি কিছু বলতে পারব না। আমি দেড় বছরের অধিক জেহাজে আছি।

প্রশ্নঃ রেশমী চিঠির তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ আমি কিছু জানিনা।

প্রশ্নঃ ওতে লেখা আছে যে, আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং আপনি ফৌজি কামান্ডার?

উত্তরঃ যদি তাই লেখা থাকে তবে যে লিখেছে সে নিজে তার জন্য দায়ী। আমি কি ফৌজি কমান্ডার হতে পারি? আমার শরীরের অবস্থা দেখুন, আমার বয়সটা দেখুন। আমি সারা জীবন মাদ্রাসায় কাটিয়ে দিলাম, আমার সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা ও ফৌজি কমান্ডার কি সম্পর্ক?

প্রশ্নঃ মৌলবী উবাইদুল্লাহ সিন্ধী সাহেব দেওবন্দে 'জামিয়াতুল আনসার' কেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তরঃ মাদ্রাসার স্বার্থে।

প্রশ্নঃ তাহলে পৃথক করা হল কেন?

উত্তরঃ নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য?

প্রশ্নঃ তাহলে কি জামাতের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না?

উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ গালিব নামা কি?

উত্তরঃ কোন গালিব নামা?

প্রশ্নঃ হেজাজের গভর্ণর গালিব পাশার চিঠি যেটা মুহাম্মাদ মিঁয়া হেজাজ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আপনি সেই চিঠি গালিব পাশার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

উত্তরঃ মৌলবী মুহাম্মাদ মিঁয়াকে আমি চিনি, তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। মদিনা মনোয়ারা থেকে তিনি আমার থেকে পৃথক হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর তিনি জেদ্দা এবং মদিনা মনোয়ারাতে প্রায় এক মাস ছিলেন। গালিব পাশার চিঠি কোথায় যা আপনি আমার কাছে আছে বলে দাবি করছেন?

প্রশ্নঃ মুহাম্মাদ মিঁয়া সাহেবের কাছে।

উত্তরঃ মৌলবী মুহাম্মাদ মিঁয়া কোথায়?

প্রশ্নঃ তিনি পালিয়ে আফগানিস্তান সীমান্তে চলে গেছেন।

উত্তরঃ তাহলে আপনি চিঠি সম্পর্কে কিভাবে জানলেন?

প্রশ্নঃ লোকেরা দেখেছিল।

(দেখুন প্রশ্নকে কিভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হল)

উত্তরঃ আপনি তো বললেন যে গালিব পাশা হেজাজের গভর্ণর আর আমি একজন সাধারণ লোক তার দরবারে আমার যাবার সাধ্য কোথায়? তদুপরি আমি একজন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ। তুর্কী ভাষা জানিনা। তুর্কী শাসকদের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। আমি হজের কয়েক দিন আগে মক্কা মোয়াজ্জামা পৌঁছেছিলাম। নিজের ধর্মীয় কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। গালিব পাশা যদিও হেজাজের গভর্ণর ছিলেন কিন্তু তায়েফে থাকতেন সেখানে পৌঁছানো আমার পক্ষে হজের আগে ও পরে সম্ভব ছিল না। এটা একেবারে অযৌক্তিক কথা, কেউ বেশ ভালভাবেই প্রচার করেছে।

প্রশ্নঃ আপনি আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সঙ্গে দেখা করেছেন?

উত্তরঃ অতি অবশ্যই।

প্রশ্নঃ কিভাবে?

উত্তরঃ তিনি মদীনাতে একদিনের জন্য এসেছিলেন। সকালবেলায় মসজিদে নববীতে উলামাদের সভা করেছিলেন। আমাকেও মৌলবী হোসেন আহমদ সাহেব এবং ওখানকার মুফতী সাহেব সেই সভায় নিয়ে যান। এবং সভার সমাপ্তিতে তিনি আমার সঙ্গে উভয় মন্ত্রীর মোসাফা করিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ আপনি ঐ সভায় বক্তৃতা করেছিলেন?

উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী করেছিলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ তারপর আনোয়ার পাশা আপনাকে কিছু দিয়েছিলো?

উত্তরঃ হ্যাঁ। এটুকু হয়েছিল যে আনোয়ার পাশার কাছ থেকে একজন লোক পাঁচ পাঁচ পাউন্ডের নোট মৌলবী হোসেন আহমদ সাহেবের বাড়িতে এসেছিলেন?

প্রশ্নঃ তখন আপনি কি করলেন?

উত্তরঃ মৌলবী হোসেন আহমদ সাহেবকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রশ্নঃ এই কাজ্জগুলোতে রেখা রয়েছে যে আপনি তুর্কী সুলতান ইরান এবং আফগানিস্তানের মিলন চান এবং ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে চান?

উত্তরঃ আমি অবাক হচ্ছি। আপনিও তো শাসন কার্যের সঙ্গে বহুদিন জড়িত রয়েছেন। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে আমার মতো একজন লোকের পক্ষে তা সম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে শায়খুল হিন্দের সাথে ব্রিটিশ অফিসারের এই কথোপকথন থেকে বুঝা যায় যে শায়খুল হিন্দের সাথে গালিব পাশা, আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। কেননা শায়খুল হিন্দ উক্ত তুর্কী শাসকদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। আসলে শায়খুল হিন্দ জানতেল তুর্কী শাসকদের সাথে যোগাযোগ করে ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে তাড়াবার যে পরিকল্পনা করেছেন তা এই ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে ফাঁস করে দিলে তাঁর উপর এবং তাঁর সাথে বন্দী বাকি উলামায়ে কেরামদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের সীমা থাকবে না। তাঁর স্বীকারোক্তিতে সকলের ফাঁসী হয়ে যেতে পারে তাই তিনি কৌশল করে তুর্কী শাসকদের সাথে আঁতাত সম্পর্কের কথা এড়িয়ে গেছেন।

এক মাস তাঁদেরকে ফাঁসীর আসামীর মতো অভ্যন্তরীন অবস্থায় রাখা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁদেরকে আসবাব পত্র গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী আপোষহীন এই স্বাধীনতাসংগ্রামীদের কাফেলাকে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নির্বাসন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টার সময় তাঁরা মাল্টার মাটিতে পাদুকাহীন পায়ে অবতরণ করেন। মাল্টার ষ্টেশনের চত্বরেই বন্দী অবস্থায় তাঁরা চারজন জোহর ও আসরের নামায পড়েন। এই মাল্টা ছিল সারা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের হেড অফিস।

শায়খুল হিন্দ ইংরেজদের যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন তা ছিল সীমাহীন । মুফতী ইন্তেজামুল শিহাবী তাঁর বিখ্যাত উর্দূ গ্রন্থ ‘উলামায়ে হক আওর উন কি মাযলুমিয়াত কি দাস্তান’

(উলামায়ে হক এবং তাঁদের উপর নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা) নামক গ্রন্থে লিখেছেন, “শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর পবিত্র মৃতদেহ গোসল দেবার সময় যখন উপুড় করা হয় তখন উপস্থিত সকলে শিহরিত হয়ে উঠেন। তারা লক্ষ্য করেন যে, শায়খুল হিন্দের কোমরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয় ছাত্র এবং কারা জীবনের সাথী হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, মাল্টার কারাগারে বন্দী অবস্থায় শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)কে প্রত্যহ সকাল বিকাল একটি ছোট্ট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে লাল টকটকে লোহা তাঁর কোমরে চেপে ধরা হত এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তাঁর অকুতভয় অবস্থান থেকে ফিরে আসার জন্য তাঁকে চরম শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহঃ) সব সময়ই এমন উত্তর দিতেন যে, স্বয়ং অত্যাচারীদের চোখও অশ্রু সজল হয়ে যেত। এভাবে শত প্রলোভন ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়েও যখন তারা হযরতকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি এবং পাবার আশাও করতে পারেনি তখন তারা তাদের এই অমানবিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকে।

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলেন, আমার উস্তাদ আমাকে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, আমি যেন তাঁর জীবদ্দশায় বন্দী জীবনের এসব অমানবিক অত্যাচারের তথ্য প্রকাশ না করি। আজ তিনি ধরা-ধামে (পৃথিবীতে) নেই। তিনি আজ তাঁর প্রিয় মনিবের অতিথি হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাই আজ আমি কথাগুলো আপনাদের সামনে নিঃসংকোচে প্রকাশ করছি।

শায়খুল হিন্দের উপর এই অত্যাচার এজন্যই করা হয়েছিল যে তিনি ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন নি এবং শরীফ হোসেনের পক্ষ অবলম্বন করে ফতোয়ায় সাক্ষর করেন নি।

প্রচন্ড শীতের সময় শায়খুল হিন্দের শরীর খারাপ হয়ে যেত। শীতে ঠান্ডা পানিতে ওজু করতে সমস্যা হবে জেনে হোসাইন আহমদ মাদানী এক বদনা পানিকে নিজের তলপেটে নিয়ে

রাখতেন উষ্ণ করার জন্য। সেই পানি উষ্ণ হয়ে গেলে শায়খুল হিন্দকে দিতেন ওজু করার জন্য। উস্তাদের মত ছাত্রও ছিলেন মহান। যেমন পীর ছিলেন মুরীদের জন্য স্নেহশীল ঠিক তেমনি মুরীদও প্রস্তুত ছিলেন মুর্শিদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

বন্দী থাকাকালীন কাল কুঠিতে কেউ কাউকে দেখতে পেতেন না। একটি ছোট ভেন্টেলেটার ছিল। প্রসাব পায়খানা করার জন্য বালতি থাকত। শায়খুল হিন্দ ছয়দিন কোন কিছু খান নি। তিনি সন্দেহ করেছিলেন খাবারে হারাম দ্রব্য মেশানো থাকতে পারে। যখন জানানো হল যে, খাবারে কোন হারাম দ্রব্য নেই তখন তিনি খেলেন। এই অন্ধকার আলো বাতাসীন কারাগারে নির্জন কক্ষে একে অপরের সাথে কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল।

অবশেষে দীর্ঘ তিন বছর চার মাস নির্মম শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করে মাল্টার অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ বন্দীজীবন কাটিয়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তাঁরা মাল্টা থেকে ছাড়া পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ তিন মাস পর তাঁদেরকে বোম্বাই বন্দরে পদার্পন করেন। বোম্বাইয়ে তখন খিলাফত আন্দোলনের কনফারেন্স হচ্ছিল। এই মর্দে মুজাহিদদের আগমনের সংবাদ শুনে ভারতের খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শাওকাত আলী এবং মহাত্মা গান্ধীও সেখানে তাঁদেরকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানোর জন্য উপস্থিত হন। স্বদেশের আযাদীর চেতনায় তাদের এতই প্রবল ছিল যে, জাহাজ থেকে নেমেই তাঁরা খিলাফত কনফারেন্সে যোগদান করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শাওকাত আলী দুই ভাইয়ে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানীকে সেই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানান। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে শায়খুল ইসলাম খেলাফত কঙ্গারেন্সের সভাপতি হতে সম্মত হন। এই কনফারেন্সেই মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীকে 'শায়খুল হিন্দ' ভারতগুরু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

দিল্লীর বিখ্যাত জামিয়া মিল্লীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন শায়খুল হিন্দ নিজ হাতে এবং জমিয়াত উলামার বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন।

কুড়ির দশকে সারা দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তোলপাড় । কিন্তু আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কিছুতেন যুক্ত হতে চাইছিলেন না। ফলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করে । পরে খিলাফত কমিটির নেতাগণ আলীগড়ে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা করেন। ১৯২০ সালের ২৯শে অক্টোবর একটি ঐতিহাসিক কনফারেন্স করার প্রস্তাব ঘোষিত হয়। সভাপতিত্বের আসন দেওয়া হয় শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর উপর। দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী থাকার জন্য তখন তিনি কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে বৃদ্ধ। বয়স প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। তিনি আসতে পারছিলেন না। দেওবন্দের ছাত্ররা তাঁকে কাঁধে পালকিতে নিয়ে আসে । শরীর এমন কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেও পারেন না। তাই তিনি লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান। সেই ভাষণটি হলঃ-

"আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এবং রোগ দুর্বলাবস্থায় যা আপনারা স্বচক্ষে অবলোকন করছেন – আপনাদের আমন্ত্রণে এজন্য সাড়া দিলাম যে, এখানে আমার একটি হারানো রত্ন (স্বাধীনতা) ফেরত পাবার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁদের চেহরায় নামাযের নুর এবং জিকরুল্লাহের আলো দীপ্ত হচ্ছে। তাদেরকে যখন বলা হয় খোদার দোহাই শীঘ্রই তৈরী হন এবং মুসলিম উম্মাহকে বিধর্মীদের চতুর্মুখী আগ্রাসান থেকে রক্ষা করুন। তখন তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়, নয় আল্লাহর ভয়, এবং কতিপয় অপবিত্র ব্যক্তি ও তাদের যুদ্ধাস্ত্রের ভয়। অথচ তাদের খুব বুঝা উচিৎ ছিল যে, ভয়-ভীতির কোন বস্তু যদি থাকে তবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ এবং তাঁর প্রতিশোধ। আর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও অগনিত পুরস্কারের মোকাবিলায় এ বসুন্ধরার তুচ্ছ সরঞ্জামের কোন মূল্য নেই।

হে আমার প্রিয় মাতৃভূমির যুবক ও তরুন ভাইসব ! আমি যখন দেখলাম, যে কারণে আমার শরীরের হাড়গুলো বিগলিত হতে যাচ্ছে, আমার সে ব্যথায় ব্যথিত লোকের সংখ্যা মাদ্রাসা ও খানকাহগুলোতে নগন্য আর স্কুল ও কলেজ সমূহে অনেক বেশী, তখন আমি ও আমার ক'জন আন্তরিক সহকর্মী আলীগড়ের দিকে এক কদম অগ্রসর হলাম । আর এভাবে হিন্দুস্থানের দুটি ঐতিহাসিক স্থান দেওবন্দ ও আলীগড়ের মধ্যে আমরা পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করলাম। অবাস্তব কথা নয়, সরল ও নিষ্ঠাবান অনেক বুযুর্গ আমার এই সফরের ছিদ্রান্বেষণ করবেন । এবং আমাকে আমার পূর্বসূরী বুজুর্গগণের মসলক থেকে প্রত্যাবৃত করে দেবেন । কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞজনেরা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারছেন, বাহ্যিকভাবে যে পর্যন্ত আমি আলীগড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছি, এর চেয়ে অনেক বেশী আলীগড় আমার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আপনাদের মধ্যে যাতা তাত্ত্বিক ও সচেতন রয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন, আমার আকাবির হজরত ভিন্নদেশী কোন ভাষা শিক্ষা করা অথবা অন্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার উপর কখনো কুফরের ফতোয়া আরোপ করেন নি । হ্যাঁ, এ সম্পর্কে অবশ্য এতটুকু বলা হয়েছে যে, ইংরেজ শিক্ষার শেষ পরিণাম যা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়, এতে মানুষ খ্রিস্টীয় কালচারের খপ্পড়ে পড়ে যায়, অথবা নাস্তিকতাসম্পন্ন ধৃষ্টতার মাধ্যমে নিজ ধর্ম ও ধর্মগুরুদের সম্পর্কে পরিহাস করতে শুরু করে, আর না হয় সমকালীন রাষ্ট্রের সেবাদাস রুপে পরিণত হয় । কাজেই এরুপ শিক্ষার্জনের চেয়ে যে কোন মুসলমানকে অজ্ঞ থাকায় উত্তম । তবে এটা অতি প্রয়োজন যে, শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রন করতে হবে । অমুসলিমদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র ও কাজ কর্ম রীতি-নীতি ও চাল চলন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজাতীয়দের প্রভাব থেকে পবিত্র হতে হবে আমাদের শিক্ষা । আমাদের ঐতিহ্যবাহী জাতিয়তার এই সিদ্ধান্ত না হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের কলেজ-ভার্সিটি থেকে অতি সস্তা মূল্যের ক্রীতদাস তৈরী করতে থাকব । বরং আমাদের কলেজ সমূহ বাগদাদ ও কারডুবার কলেজ-ভার্সিটির আদর্শের উপমা হওয়া উচিত এবং ওই সকল ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার দৃষ্টান্ত, যারা সমগ্র ইউরোপকে নিজেদের তাবেদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন । পক্ষান্তরে আমরা আজ ওদেরকে আমাদের গুরু বানাতে চাচ্ছি। আপনারা শুনে থাকবেন যে, ইসলামী হুকুমতের

কর্ম-কর্তাদের নেতৃত্বে বাগদাদে যখন সুলতানিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেখানকার উলামায়ে কেরাম সমবেত কণ্ঠে আহাজারি করেছিলেন সেদিন। হায়, আফশোস! আজ থেকে রাষ্ট্র এবং পদমর্যাদা হাসিলের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া হবে। তাহলে কি আপনারা এমন কোন কলেজ দ্বারা জাতির কল্যানের আশা করতে পারেন। যার অর্থ-সাহায্যে এবং পরিচালনায় একটা অনৈসলামিক রাষ্ট্রের শক্ত দখলদারী রয়েছে?

একথাটি আজ অনস্বীকার্য যে, আমাদের মুসলিম জাতির মহান নেতৃবর্গ উম্মতে মুসলিমার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মুসলমানদের বিদ্যালয়ের যেগুলোতে আজ আধুনিক জ্ঞানের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, এগুলোর ছাত্রগণ যদি স্বীয় ধর্মের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়াদি ও ইসলামের অত্যাবশকীয় ফরজ সমূহকে ভূলে যায় এবং ওদের মধ্যে স্বীয় ধর্ম ও স্বজাতির সহযোগিতা তুচ্ছ হারে পাওয়া যায়৷ তবে বিশ্বাস করুন নিঃসন্দেহে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের ভিতকে দুর্বল করার একটা ষড়যন্ত্র হবে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্বাধীন ও বেসরকারী এমন ইউনিভার্সিটি তৈরী করা হবে, যেটা হবে সরকারী সাহায্য ও সকল প্রকার প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং সমূহ কর্মনীতি হবে ইসলামী চরিত্র ও জাতীয় অনুভূতিশীলতার উপর নির্ভরশীল।”

এই ঐতিহাসিক অমূল্য ভাষণটি মাওলানা মুখলিসুর রহমান রাজা গঞ্জী লেখা ‘মুসলিম জাহান’ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। ষষ্ঠ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২০ – ২৬ নভেম্বরঃ ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। (তথ্যসূত্রঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান, সেখ আজিবুল হক)

দীর্ঘদিন কারাগারে ব্রিটিশদের নির্যাতন ও যন্ত্রনা ভোগ করার ফলে শায়খুল হিন্দের শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর মঙ্গলবার দিন তিনি সাতবার ‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণ করে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) এর পাশে সমাহিত করা হয়। সারা দেশ জুড়ে তাঁর শোক-সভা হয়। কাবুলের আমীর আমানুল্লাহও অভুতপূর্ব শোক-সভার আয়োজন করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেছিলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে হযরত শায়খুল হিন্দের এত উচ্চ মর্যাদা আমরা কল্পনাই করতে পারি নি।"

(দ্রষ্টাব্যঃ মাল্টার বন্দী, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহির)

মৃত্যুকালে শায়খুল হিন্দ বলেছিলেন,

"মৃত্যুতে তো কোন আক্ষেপ নাই
কিন্তু আফশোস যে, আমি বিছানার উপর মরছি।
আকাঙ্খা তো ছিল আমি জিহাদের ময়দানে থাকতাম
এবং আল্লাহর কথা বুলন্দ করার অপরাধে
আমাকে টুকরো টুকরো করা হতো।"

(নকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭)

শায়খুল হিন্দ ইংরেজদের যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন তা ছিল সীমাহীন। মাল্টা জেল থেকে মুক্ত হবার পর একদিন ডাঃ আনসারী তাঁর বাড়িতে শায়খুল হিন্দকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন দেখা যায় তাঁর পৃষ্ঠদেশের সর্বত্র কালো দাগ। পিছনের একদিকে মাংসের লেশ মাত্র নেই। শুধুই হাড় দেখা যাচ্ছে। যিনি স্নান করাচ্ছিলেন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। হোসেন আহমদ মাদানী বলেন, লোহার শলাকাকে উত্তপ্ত করে ওখানে ছেঁকা দেওয়া হত। যেহেতু তিনি ফতোয়ায় সাক্ষর করেন নি, সেজন্য এ অত্যাচার।

প্রচন্ড শীতের সময় শায়খুল হিন্দের শরীর খারাপ হয়ে যেত। শীতে ঠান্ডা পানিতে ওজু করতে সমস্যা হবে জেনে হোসাইন আহমদ মাদানী এক বদনা পানিকে নিজের তলপেটে নিয়ে রাখতেন উষ্ণ করার জন্য। সেই পানি উষ্ণ হয়ে গেলে শায়খুল হিন্দকে দিতেন ওজু করার জন্য। উস্তাদের মত ছাত্রও ছিলেন মহান। যেমন পীর ছিলেন মুরীদের জন্য স্নেহশীল ঠিক তেমনি মুরীদও প্রস্তুত ছিলেন মুর্শিদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর সারা জীবন কেটেছে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে। যখন তিনি কাসেমুল উলুম ওয়াল খায়রাত মুহাদ্দীসে আযীম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) এর মত পরশ পাথরের সংস্পর্শে আসেন তখন তিনি পূর্ণিমার আলোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে যান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অদম্য প্রেরণা নিয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী দেওবন্দ শহর থেকে বের হন। জিহাদের অদম্য প্রেরণা নিয়ে শায়খুল হিন্দ যখন দেওবন্দ থেকে যাত্রা করেন তখন তাঁর মন-মস্তিষ্ক ছিল জিহাদী জযবার এক এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গীরি। তখন এবং তোরাবলাসের রক্তক্ষয়ী ঘটনা বলী তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেশমী রুমাল আন্দোলন পরিচালনায় দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

শাউখুল হিন্দ ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর বিপ্লবী চিন্তাধারার সংরক্ষক এবং শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) এর দ্বীনি অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। দেশ ও জাতির দুর্দশায় তাঁর পরম সহমর্মিতা ছিল।

খদ্দরের পোষাক পরিহিত শায়খুল হিন্দ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং বিচক্ষন রাজনীতিবিদ। তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ বিরোধী জনমত প্রতিষ্ঠার কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দেন। তিনি নিজেই ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রায় বলতেন, দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনই হয়েছে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণের জন্য।

তিনি রহীম ইয়ার খান জেলার দ্বীনপুর, আম্রুট শরীফ, পীরজন্ডা জেহলাম জেলায় মোট পাঁচটি গোপন ঘাঁটি স্থাপন করেন। সেসব ঘাঁটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন করে সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ইয়ামানিস্তানের স্বাধীন অঞ্চলকে সৈন্যদের সশস্ত্র ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারণ করেন। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে এই সময়টা ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই রাশি রাশি বিপদের প্রবল আশংকা ছিল। তখন নিজেদের অব্যন্তরীণ গোপন পরামর্শের পরও কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এই বিষাক্ত হাওয়া চারদিক থেকে গোটা কর্মসূচী আচ্ছন্ন করে রাখে।

মাত্র কিছুদিন পুর্বে ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলান হয়েছে। অনেককে অথৈ সমুদ্রের অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক আলেমকে বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে অগ্নি-দগ্ধ টকটকে লাল তামার কাঠি দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছে। নির্যাতন নিপীড়নের এসব বন্ধুর গিরিপথ পাড়ি দিয়ে আদম সন্তানের আত্মা ত্রাহী ত্রাহী করে দুঃসহ জীবন অতিক্রম করছিল। কিন্তু শত নির্যাতনের পরও ইংরেজ শাসক সেই ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার মত সাহস তো দুরের কথা; তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সত চিন্তাটুকু করার মত সৎসাহসও কেউ করত না। সবাই সব সময় নিজের জীবন নিয়েই উৎকণ্ঠিত থাকত। সবার মনে সব সময় এসব প্রশ্ন উঁকি দিত, “কে এই বন্ধাত্ব দূর করবে? কে এই স্তিমিত আন্দোলন পূনরুজ্জীবিত করবে?” এসব প্রশ্ন মানুষকে হতাশ করেছিল।

সেই নির্যাতনের চরম মুহুর্তে লোকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখলো, দারুল উলুম দেওবন্দের হাদীস শাস্ত্রের একজন স্বনামধন্য উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাথায় কাফন বেঁধে এ হতাশ পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য ঘর থেকে জেহাদের ময়দানে বেরিয়ে পড়েছেন। এরপর কি হল তার ইতিহাস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খুল হিন্দের অধিকাংশ ইতিহাস ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় কিভাবে শায়খুল হিন্দ ব্রিটিশ বিরোধীতা তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন এবং ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করার জন্য তুরস্ক সরকারের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নাস্তানাবুদ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ‘রেশমী রুমালের আন্দোলন’ এর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার জেনে গেলে সব পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে যায়।

আমার ধারণা, সেই রেশমী রুমালের আন্দোলনের ব্যাপারে যদি ব্রিটিশ সরকার না জানতে পারত এবং মক্কার বিদ্রোহী শরীফ হুসেন যদি ইসলামের চরম শত্রু ব্রিটিশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে হেজাজ থেকে তুর্কী খেলাফতের পতন না ঘটাত তাহলে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশদের আঘাত হানতেন

তাহলে সেদিন তুর্কী সেনাদের কাছ থেকে ব্রিটিশদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হত। আর এটা হলে সেদিনই ভারত স্বাধীন হওয়া অনিবার্য ছিল। আর সেদিন ভারত স্বাধীন হলে পুনরায় ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে চলে আসত এবং এই মুসলিম জাতি পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পেত। কিন্তু কিছুলোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এটা সম্ভব হয়নি।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) দীর্ঘ দিন যাবত দারুল উলুম দেওবন্দে নবী (সাঃ) এর হাদীসের শিক্ষা দেন। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি অনুবাদ রচনা করেন। যা পরবর্তীতে ‘তাফসীরে উসমানী’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি আরবী সাহিত্যের অলনঙ্কার শাস্ত্রের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ ‘মুখতাসারুল মাআনী’র আরবী টীকা সংযোজন করেন। এছাড়াও তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করে জাতিতে উপহার দিয়ে যান। তাছাড়াও তিনি রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াতের উপর ‘আদিল্লায়ে কামিলা’ এবং ‘ইযাহুল আদিল্লাহ’ নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে সারা পৃথিবীর গায়ের মুকাল্লিদদের জবান বন্ধ করে দেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের জবাব আজ পর্যন্ত কোন গায়ের মুকাল্লিদ দিতে পারেনি। ‘মিসবাহুল আদিল্লাহ’ কিতাবের জবাবে তিনি ‘ইযাহুল আদিল্লাহ’ নামে লেখেন। মিসবাহুল আদিল্লাহ কিতাবের লেখক আহসান আমরুহি। তিনি আর ‘ইযাহুল আদিল্লাহ’ কিতাবের পালটা জবাব দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানী ও বেইমান হয়ে মারা যান। এটা শায়খুল হিন্দের মাযহাব বিরোধীদের প্রতি আশ্চর্য্যজনক কারামত।

তাঁর জ্ঞানদ্বীপ্ত শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে এমন অনেক মহান মনীষী তৈরী হয়েছেন; যাঁদের দৃষ্টান্ত পেশ করা গোটা ইসলামী জগৎ আজও সক্ষম হয়নি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ

১) হাকীমুল উম্মাত, মুজাদ্দীদের দ্বীন ও মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)।

২) দাওয়াত ও তাবলীগ জামাআতের রুপকার ও পুরোধা হযরত মাওলানা ইলিয়াস দেহলবী (রহঃ)

৩) ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা, অকুতোভয় সিপাহসালার হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)।

৪) যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, অনুপম স্মৃতিশক্তির অধিকারী আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ)।

৫) মুক্তির দিশারী শায়খুল আরবে ওয়াল আজম, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)।

৬) বিশিষ্ট ইসলামী আইনবিদ মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী (রহঃ)।

৭) শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)।

এঁরা হলেন সেসব ব্যক্তিত্ব, যাঁদের জ্ঞান, মহানুভবতা, উদারতা, খোদাভীতি, পরহেজগার, বীরত্ব, রাজনীতি, দাওয়াত, তালিম, জিহাদ ও রচনার বিষয়ে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মৃত্যুশয্যায় হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছি। সর্বত্রই বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুক্তির শ্লোগান দিয়েছি। পাহাড়-পর্বত, গুহা, মাঠ, জঙ্গল, নদী-সাগর, এক কথায় সর্বত্রই জীবনের বিস্বাদ ও তিক্ত রাত্রি যাপন করেছি। তুরস্ক, আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন ও হেজাজ, যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মুসলমানদের উপর ইংরেজ তথা ইহুদী খ্রীষ্টান অমুসলিম পশুদের পৈশাচিক নির্যাতনের চিত্র দেখেছি।

আমার চিন্তা শক্তি আহত, আমার কলিজা রক্তাক্ত, আমার চিন্তা-চেতনা বিপর্যুস্ত, কাজেই আমি কোথা হতে আযাদীর দুস্প্রাপ্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিবো।

তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। মুনাফিক, প্রতারক ও ধুর্তরা আমার শায়খুল হিন্দ (রহঃ) – এর এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়ে জাতিকে একটি দীর্ঘ সময়ের

জন্য দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে। যা আমার অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং আহাজারীর নমূনা হয়ে রয়েছে। কোন মানুষের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। কোন আহার্য আমার ভাল লাগে না। কোন কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। তারা আমার দেহ-মনকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে আমাকে যেন জন মানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে দিয়েছে।”

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর রাজনৈতিক অভিযান

স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার চেপানওয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তাঁর পুর্বপুরুষেরা ছিল কর্মকার বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পরে তিনি শিখ ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১২ বছর বয়সে শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর প্রণীত গ্রন্থ ‘তুফহাতুল হিন্দ’ বা ‘হিন্দুস্থানের উপহার’ নামক গ্রন্থটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি শাহ ইসমাইল শহীদের তাওহীদের অমর গ্রন্থ ‘তাকবীয়াতুল ঈমান’ পড়েন। পরবর্তীকালে তিনি ‘আহওয়াতুল আখেরাত’ নামক গ্রন্থটি পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যেহেতু ‘আহওয়াতুল আখেরাত’ নামক গ্রন্থটির লেখকের নাম উবাইদুল্লাহ তাই তিনি লেখকের নামানুসারে নিজের নামও রাখেন উবাইদুল্লাহ।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণে তিনি প্রথমে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ গোপন রাখেন। দুই বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণের সংবাদ সবার সম্মুখে প্রকাশ করেন। এরপর সিন্ধের আধ্যত্মিক রাহবার সায়্যিদুল আরেফীন হযরত হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দিক ভারজুন্ডির খিদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ইসলাম গ্রহণের চার বছর অতিক্রম হতে না হতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবী এলাকা রহীমইয়ার খানের দ্বীনপুর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী তৎকালীন সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় আলেম খাজা গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব দ্বীনপুরীর কাছ থেকে দ্বীনি কিতাবাদীর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। এরপর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দে পৌঁছেন এবং সেখানে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর কাছে হাদীস শিক্ষা সমাপন করেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন শায়খুল হিন্দের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। একদিন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ)কে স্বপ্নে দেখেন।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী প্রায়ই বলতেন, শায়খুল হিন্দের সাক্ষাত লাভের পর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মন-মস্তিস্কে আন্দোলনের চিন্তা-চেতনা ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আর এতে সবচেয়ে বেশী কার্যকারী ভূমিকা পালন করে হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ পাঠের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী অভূতপূর্ব মেধা এবং অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী শায়খুল হিন্দের কাছে এবং কুতুবে রাব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর নিকটও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সনদ প্রাপ্ত হন। শেখর ইসলামীয়া স্কুলের শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ কাজিম খান ইউসুফজাই এর কন্যার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) এর ব্যাপারে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর অধ্যায়ে কিছুটা হলেও আলোচনা করা হয়েছে, কেননা উক্ত দুই বুযুর্গের রাজনৈতিক জীবন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একজনের আলোচনা করলে অন্যজনের নাম স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। তাই আমরা এখানে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর বাকি রাজনৈক কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ‘শেখরে দারুল এরশাদ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শায়খুল হিন্দের পরামর্শে দেওবন্দে চলে আসেন এবং সেখানে তিনি প্রাক্তন দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদের নিয়ে ‘জমিয়াতুল আনসার’ নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তিনি শায়খুল হিন্দের নির্দেশে কাবুল যাত্রা করেন এবং সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ডে তৎপর হয়ে উঠেন। সেখানে তিনি স্বাধীন ভারত সরকার গঠনে তৎপর হয়ে উঠেন। সেই সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাওলানা বরকাতুল্লাহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী নিজে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি তুরস্ক, রাশিয়া ও জাপানের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং আফগান সরকারকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সাথে আফগানদের যুদ্ধ বাঁধলে তিনি আফগানদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ‘জুনুদুল্লাহ’ নামে নিজস্ব বাহিনী যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর আশ্চর্য্য কূটকৌশলে সেই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাস্ত করেন। আফগানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর আশ্চর্য্য দুরদর্শীতার ফলে এই ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন।

এই যুদ্ধের পর মিঃ টমসনকে তাঁরা 'কুতুল উমরা' নামক স্থানে বন্দী করে রাখেন। মিঃ টমসন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১৭০০ ব্রিটিশ সৈন্য মারা যায়। এই যুদ্ধে শায়খুল হিন্দ আফগানিস্তান, তুরস্ক ও ইয়াগীস্তান প্রভৃতি দেশের সাহায্য নিয়ে আফগানী মুজাহিদবৃন্দের সহযোগিতায় ইংরেজদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর W.W. Hunter তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Indian Musalman' গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন, "তারা অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদরা ইংরেজ সৈন্যকে কবর দিয়েছিল প্রতিটি বালুকায়।"

আফগানিস্থানের জাহির শাহ বলেন, "আমরা দেওবন্দের মনীষীদের দ্বারাই বিজয়লাভ করেছি।" ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হামফ্রে বলতে বাধ্য হন, "এ জয় আফগানিস্তানের নয় এ জয় উবাইদুল্লাহর জয়।"

ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জুনুদুল্লাহ বাহিনীর মেজর জেনারেল ছিলেন শায়খুল হিন্দ, লেফটেন্যান্ট জেনারেন ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গিমহলী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, হাজী তুরঙ্গজাই, ডাঃ আনসারী, মেজর জেনারেল হিসাবে সৈয়দ সুলাইমান নাদভীরও নাম পাওয়া যায়। লেফটেন্যান্ট কর্ণের হিসাবে নাম পাওয়া যায় মাওলানা জাফর আলী, কর্ণেল হিসাবে মাওলানা ইবরাহীম শিয়ালকোটীরও নাম পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে আরও যেসব ব্যক্তির নাম জানা যায় তাঁরা হলেন যথাক্রমে, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, হাফিজ নাসীর আহমদ, মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া, মাওলানা আব্দুর রহীম, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, আল্লাহ নাওয়াজ খান, সৈয়দ হাদী, কালা সিং প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। এইসব ব্যক্তিরা মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর জুনুদে রব্বানীর সাথে যুক্ত ছিলেন বলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা যায়।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, শায়খুল হিন্দ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য তুর্কী খলিফাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে 'জমিয়তে হিজবুল্লাহ'র যে স্ট্যাম্প ছিল তার তারিখ ছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। এই 'জমিয়তে হিজবুল্লাহ' গঠন হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থে মক্কা শরীফের মাদ্রাসা 'মাদ্রাসা সাওলাতিয়া'র কিছু ছাত্র শায়খুল হিন্দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে বিদেশের সাথে

শায়খুল হিন্দের যোগাযোগ কত বিস্তৃত ও বিশাল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে সমস্ত পরিকল্পনা একেবারেই ভেস্তে যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা আছেঃ – "মুসলমান জাতির এক অংশ তখনও (১৯১৪-১৯১৫) ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিল। জেহাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাড়াও আর এক দল মুসলমান বিদেশী রাষ্ট্র কাবুল ও তুরস্কের সহায়তায় ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করতো। তাঁদের নেতা ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার মাওলানা উবাইদুল্লাহ ও তাঁর সহকর্মী মাওলানা মাহমুদুল হাসান। তারা হিজাজ ও কাবুলে উপমহাদেশীয় মুসলিম প্রবাসীদের সহায়তায় ও কাবুলের আমীরের সাহায্যে বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র করতেন।" (Sedition Committee Report, P. 174)

কাবুলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর যাত্রা ও কাবুলের সুলতান তথা আমীর হাবীবুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ- একটি বিষয় স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে, হযরত শায়খুল হিন্দের সঠিক পরামর্শ আমি না পেলে আমার কথা এত কার্যকরী হতো না। হয়ত আমি আফগান রাজদরবারে নিজেকে এক ভারতীয় মুসলমান হিসাবে পরিচয় না দিয়ে কেবল একজন মুসলমান বলেই পরিচয় দিতাম। অল্পদিন পরেই হয়তো আমাকে ভারতীয় বলে প্রমাণ করতে হতো।" (রোজনামচা, উবাইদুল্লাহ সিন্ধী)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে আমীর হাবীবুল্লাহ খান কাবুলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে এবং অন্যান্য বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দকে নজরবন্দী করেন এবং অস্থায়ী ভারত সরকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীসহ ২০/২৫ জনকে একটি ছোট্ট কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরে সিন্ধীকে জালালাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশ্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে আমানুল্লাহ খান কাবুলে ক্ষমতায় এলে দীর্ঘ ১ বছর ৮ মাস পর মাওলানা সিন্ধীকে কারামুক্ত করে কাবুলে ফিরিয়ে আনেন। এরপর তিনি ৩ বছর ৮ মাস আমানুল্লাহ খানের আস্থাভাজন হিসাবে আমানুল্লাহ সরকারের কল্যানে কাজ করে যান। এসময় তিনি অস্থায়ী ভারত সরকারের বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুনে আমানুল্লাহর সাথে ব্রিটিশ ভারতের যে যুদ্ধ হয় তাতে মাওলানা সিন্ধীর জুনুদে রব্বানীর মুজাহিদরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে আমানুল্লাহ বাহিনী তাতে জয়ী হয় এবং ব্রিটিশদের পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়। যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

সর্বমোট ৭ বছর ৭ দিন কাবুলে অবস্থান করার পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাঁকে বাধ্য হয়ে কাবুল ছাড়তে হয়। এভাবেই তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এ আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটলেও মূলতঃ সে আন্দোলনই যুগে যুগে স্বাধীনতার ইন্ধন যুগিয়েছে।

এ ভাবে প্রথম পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু ও মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী বিদেশনীতির ব্যাপারে কতখানী দুরদর্শী ও কুটনৈতিক রাজনীতিবিদ ছিলেন তা বুঝা যায় যখন তিনি নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুকে বিদেশে পাঠান।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু বুঝেছিলেন নরমপন্থী কংগ্রেসের সাথে থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। তাই তিনি চরমপন্থী নীতিকে অনুসরণ করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান থেকে জাপানে পালিয়েছিলেন এর মূলেও ছিল মাওলানা সিন্ধীর পূর্ব অভিজ্ঞতা। নেতাজী মেজার হামিদের সহযোগিতা নিয়ে অতি গোপনে সাবমেরিনে চড়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। বিদেশে যাওয়ার আগে নেতাজী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর পরামর্শকে কাজে লাগিয়েছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর নেতৃত্বে মক্কা, হেজাজ, তুরস্ক প্রভৃতি বিদেশে সংগঠন করে ভারত আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। অনুরুপ নেতাজীও জাপান, জার্মান, ফ্রান্স, কাবুল প্রভৃতি বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করার পথ বেছে নিয়েছিলেন। নেতাজীর বিদেশনীতির মূলেও ছিল মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর পরিকল্পনা। নেতাজী যে ব্রিটিশদের কারাগারে নজরবন্দী থাকাকালীন মৌনব্রত পালন করেছিলেন, অসুখের ভান করেছিলেন, একাকীত্ব থাকার পথ অবলম্বন করেছিলেন তার সব পরিল্পনা ছিল মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর। পরে কাবুলীওয়ালার পোষাক পরে টুপি দাড়ী ছেড়ে মাওলানা জিয়াউদ্দীন ছদ্মনাম ধারণ করে ফার্রাটেদার (চোস্ত) উর্দূ বলতে বলতে ব্যবসার নাম করে অতি সঙ্গোপনে গভীর রাত্রিতে ভাইপো শিশির কুমার বসুকে সাথে নিয়ে কারে করে জার্মানির উদ্দেশ্য দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু দুস্তরভাবে পড়ি দেন তার সমস্ত পরিকল্পনা ছিল মাওলানা উবাইদুল্লাজ সিন্ধী দেওবন্দীর। নেতাজীর মাওলানা জিয়াউদ্দীন ছদ্মনাম দিয়েছিলেন মাওলানা সিন্ধী নিজে।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈদেশীক আক্রমণের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের এদেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব। তাই তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে হাতিয়ার বানিয়ে তুরস্কের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তাই উবাইদুল্লাহ সিন্ধী চেয়েছিলেন আবার বৈদেশীক আক্রমণের মাধ্যমেই ব্রিটিশ ভারকে আক্রমণ করতে। কিন্তু এটা তাঁর পক্ষে আর দ্বিতীয়বার করা সম্ভব ছিল না এবং সেরকম কোন পরিস্থিতিও ছিল না। তাই তিনি এই কাজ করার জন্য নির্বাচন করেছিলেনহ নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুকে। আর নেতাজীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "নেতাজীকে যিনি পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন তিনি হলেন উবাইদুল্লাহ সিন্ধী। তিনিই নেতাজীর নাম দিয়েছিলেন মাওলানা জিয়াউদ্দীন। তিনিই ছদ্মবেশে প্রথমে কাবুলে তারপর বিভিন্ন দেশে পাঠান।" (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে কেরামদের অবদান, পৃষ্ঠা-২৮)

নেতাজী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর পরিকল্পনা পুরোপুরী মেনে চলেন এবং বিদেশ থেকে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। সেজন্য মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর নেতৃত্বের আদর্শগত মিল দেখতে পাওয়া যায়।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধী	নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু
১। আন্দোলন করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে	১। আন্দোলন করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে
২। অভিযান করেন-উঃ পঃ সীমান্ত	২। অভিযান করেন-উঃ পূ সীমান্ত
৩। সাহায্য পান-আফগান তুরস্ক	৩। সাহায্য পান-জাপান ও জার্মানদের
৪। কাবুলে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন ১৯১৫, ডিসেম্বর	৪। সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন ১৯৪৩, অক্টোবর
৫। নিজ বাহিনীর নাম জুনুদুল্লাহ	৫। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ
৬। প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ	৬। কর্ণেল আবিদ হাসান, জেনারেল শাহনাওয়াজ

সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দ উপহার দিয়েছেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর মত একজন দেশপ্রেমী নেতা।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী দীর্ঘ ২৫ বছর কারাগারে জীবন অতিবাহিত করেন। যখন তাঁকে জেলে বন্দী করা হয় তখন তার দাড়ি গজায় নি কিন্তু যখন তিনি জেল থেকে ছাড়া পান তখন তাঁর দাড়ি পেকে

সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেশের জন্য যে আত্মবলীদান দিয়েছেন তাতে ভারতবাসী তাঁকে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীকে মাল্টার জেল থেকে মুক্ত করার দশ বছর পর তাঁকে দেশের মাটিতে আনা হয়। যতদিন শায়খুল হিন্দ জীবিত ছিলেন ততদিন মাওলানা সিন্ধীকে দেশে ফিরতে দেওয়া হয় নি। কারণ ব্রিটিশ বেনিয়ারা জানত শায়খুল হিন্দ ও মাওলানা সিন্ধী একত্রে থাকলেই ব্রিটিশদের কাছে এক বড় বিপদ। তাই শায়খুল হিন্দ মারা যাবার পর মাওলানা সিন্ধীকে দেশে আনা হয়। মাওলানা সিন্ধীকে দেশে এনেও দিয়েও ব্রিটিশরা শান্তিতে থাকতে পারেনি। পরে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে। তিনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। কিন্তু ব্রিটিশরা দেশবাসীকে তা জানতে দেয় নি। তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এক বছর ৯ দিন পর সরকারীভাবে স্বীকার করে যে মাওলানা সাহেব নিহত হয়েছেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মাওলানা জহীরুল হককে একটি চিঠিতে লেখেনঃ-

স্নেহের মওলুবী জহীরুল হক
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ
আজাদী উপলক্ষে আপনার প্রতি প্রেরিত পত্রের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। পত্র পড়ে স্মৃতি-পটে ভাসে শুধু মওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর স্মৃতি। সে ঘটনা অনেক লম্বা। সংক্ষেপে করলেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহর কাফেলার নেতা হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান (রাঃ) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুল প্রেরণ করেন। সেখানে মওলানা ওবায়দুল্লাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ লাভ করেন। তারমধ্যে জার্মান, ফ্রান্স ও জাপানের এমন সব কর্মী নেতা ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ……

পঁচিশ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে ১৯৩৯ এ তিনি যখন এখানে আসেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কংগ্রেসের কাছে পেশ করে সর্ব ভারতীয় সংগ্রামের প্রোগ্রাম রচনা করেন। সেই সময় গান্ধীজী পর্যন্ত ওই প্রোগ্রামের বিরোধীতা করেন। তাহলেও ‘ভাতছাড়ো’ আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে।

দ্বিতীয় দফায় উথলা হতে দিল্লী পর্যন্ত আট মাইল সড়কের কোন একটি জন মানব শূন্য স্থানে তাঁর সঙ্গে সুভাসের দেখা হয়। তার পরের সাক্ষাৎটি হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। এখানেই তিনি সুভাসকে জাপান যাত্রার জন্য রওনার ব্যবস্থা করেন। জাপান সরকারের নামে অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের যাত্রী হিসাবে তিনি একটি পরিচয়পত্র দেন এবং সেখানকার প্রধান সেনাপতির নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষ বার্তা পাঠান। এই সুভাস সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জাপান সরকারের সৈন্য বিভাগ ও তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ……

শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষ প্রয়োগে মওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা হয়।

১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পুরো এক বছর ন'দিন পর সরকারী ভাবে স্বীকার করা হয় মওলানা সাহেব নিহত হয়েছেন। স্বাভাবিক এমনি একটি বিপ্লবীকে ওজনের তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা পৃথিবী চাপালেও এই বিপ্লবীর সমান হয় না। ….

আপনার সম্মানীয় মাতার প্রতি রইল আন্তরিক সালাম।

ইতি

আবুল কালাম আজাদ।

(দ্রষ্টাব্যঃ ইনসানিয়াত পত্রিকা মওলানা মোহাম্মদ তাহের, অনুবাদ-মওলানা আব্দুল কাদের/তথ্যসূত্রঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান, শেখ আজিবুল হক)

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী একজন ভাল লেখকও ছিলেন। নির্বাসনের পর তিনি কিছু গ্রন্থও রচনা করেন। যার মধ্যে 'এলহামুর রহমান' একটি উঁচু পর্যায়ের তাফসীর গ্রন্থ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তাফসীরে তিনি জাতিকে ইসলামের বিপ্লবী ও জিহাদী আহ্বান নতুন আঙ্গিকে পেশ করেন। এছাড়াও তিনি 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ আউর উন কি সিয়াসী তাহরীক' (শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা), 'কুরআনী দস্তুরে ইনকিলাবী', 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর দর্শন'।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী পরাধীন দেশের মুসলিমদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেনঃ- "তোমরা এ যে খেলনার ঘর তৈরী করেছ এবং একই বিশাল আসমান বলে বিশ্বাস করে নিয়েছ কালের প্রবাহের মুখে এ

টিকে থাকতে পারে না। তোমাদের অর্থনীতি সব কিছুর মধ্যে ঘুণ ধরেছে। তোমরা একেই ইসলামী সভ্যতা নাম দিয়েছ, কিন্তু এতে ইসলামের কোন চিহ্ন নেই। তোমরা তোমাদের গোঁড়ামিকেই মাজহাবের নামে চালিয়ে নিচ্ছ। মুসলমান হতে চাও তো ইসলাম কি, সে আগে বোঝ। তোমরা যাকে ইসলাম বলছ, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের নেতৃবৃন্দ পদমর্যাদা লোভী। তোমাদের শাসকবৃন্দ ভোগ বিলাসী এবং তোমাদের জনসাধারণ বিভ্রান্ত। জাগো পরিবর্তন আনো। নতুবা যুগ তোমাদের চিহ্ন মিটিয়ে দেবে।"

মৃত্যুশয্যায় হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছি। সর্বত্রই বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুক্তির শ্লোগান দিয়েছি। পাহাড়-পর্বত, গুহা, মাঠ, জঙ্গল, নদী-সাগর, এক কথায় সর্বত্রই জীবনের বিস্বাদ ও তিক্ত রাত্রি যাপন করেছি। তুরস্ক, আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন ও হেজাজ, যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মুসলমানদের উপর ইংরেজ তথা ইহুদী খ্রীষ্টান অমুসলিম পশুদের পৈশাচিক নির্যাতনের চিত্র দেখেছি।

আমার চিন্তা শক্তি আহত, আমার কলিজা রক্তাক্ত, আমার চিন্তা-চেতনা বিপর্যুস্ত, কাজেই আমি কোথা হতে আযাদীর দুস্প্রাপ্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিবো।

তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। মুনাফিক, প্রতারক ও ধুর্তরা আমার শায়খুল হিন্দ (রহঃ) – এর এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়ে জাতিকে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে। যা আমার অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং আহাজারীর নমূনা হয়ে রয়েছে। কোন মানুষের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। কোন আহার্য আমার ভাল লাগে না। কোন কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। তারা আমার দেহ-মনকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে আমাকে যেন জন মানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে দিয়েছে।" [তথ্যসূত্রঃ আকাবিরদের জিহাদী জীবন, মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী শহীদ (রহঃ), পৃষ্ঠা – ৮৪]

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-
২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-
৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-
৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) (অফলাইন/অফলাইন) ৬০/-
৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন)৭০/-
৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-
৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-
৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ---
১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ---
১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ---
১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-
১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ---
১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ---
১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-
১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-
১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ---
১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-
১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ---
২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ---

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ---
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ---
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ---
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ---
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন)২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) 'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-

৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-

৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ
আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০

৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-

৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-

৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-

৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-

৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-

৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

৫৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান [অনলাইন] ১৫০/-

৫৬) শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক অভিযান [অনলাইন] ৪০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ---

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-